মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি বিষয়ক

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের জন্য

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ,
ঢাকা, বাংলাদেশ

NCDC
Directorate General of Health Services

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি বিষয়ক

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের জন্য

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ,
ঢাকা, বাংলাদেশ

NCD
Directorate General of Health Services

World Health Organization
Country Office for Bangladesh

National Institute of Mental Health, Dhaka, Bangladesh
Training Manual on Mental Health and Substance Abuse for Nurses and Paramedics

ISBN: 978-984-33-9149-0

© World Health Organization 2015

Printed in Dhaka, Bangladesh
December 2015

Suggested citation:

National Institute of Mental Health, Ministry of Health and Family Welfare, World Health Organization. Training Manual on Mental Health and Substance Abuse for Nurses and Paramedics. Third edition. World Health Organization. Dhaka, 2015.

সম্পাদনা কমিটি

সভাপতি

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল হামিদ
পরিচালক ও অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট (এনআইএমএইচ), ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ এনায়েত হোসেন
লাইন ডাইরেক্টর, এনসিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যাপক ডাঃ এম. মোস্তফা জামান
ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার (এনসিডি), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা

মোঃ মনিরুজ্জামান
ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ ফারুক আলম
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, চাইল্ড এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল মোহিত (মোহিত কামাল)
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সাইকোথেরাপী বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ তাজুল ইসলাম
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, কমিউনিটি অ্যান্ড সোসাল সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

অধ্যাপক ডাঃ নিলুফার আখতার জাহান
অধ্যাপক, জেরিয়াট্রিক অ্যান্ড অর্গানিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মহাদেব চন্দ্র মন্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, এডাল্ট সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোহাম্মদ খসরু পারভেজ চৌধুরী
সহযোগী অধ্যাপক, ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোঃ ফখরুজ্জামান শহীদ
সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোঃ ফাহমিদ উর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি অ্যান্ড সোসাল সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

মোঃ জহির উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, সাইকোথেরাপী বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ অভ্র দাশ ভৌমিক
সহকারী অধ্যাপক, জেরিয়াট্রিক অ্যান্ড অর্গানিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী অধ্যাপক, এডাল্ট সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ ফারজানা রহমান
সহকারী অধ্যাপক, কমিউনিটি অ্যান্ড সোসাল সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ হেলাল উদ্দিন আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক, চাইল্ড এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান খান
সহকারী অধ্যাপক, চাইল্ড এডোলেসেন্ট অ্যান্ড ফ্যামিলি সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মেখলা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, ফরেনসিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ মোহাম্মদ তারিকুল আলম
সহকারী অধ্যাপক, জেরিয়াট্রিক অ্যান্ড অর্গানিক সাইকিয়াট্রি বিভাগ, এনআইএমএইচ, ঢাকা

ডাঃ সাইফুল নাহার
সহকারী অধ্যাপক, এনআইএমএইচ, ঢাকা

মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি বিষয়ক

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের জন্য

ISBN: 978-984-33-9149-0

প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০১৫

প্রকাশনায়
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সহযোগিতায়
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ঢাকা, বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক দেশব্যাপী গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বয়স্ক জনগণের মধ্যে ১৬.১ শতাংশ এবং আঠারো বছরের নিচের শিশু-কিশোরদের মধ্যে ১৮.৪ শতাংশ যেকোন ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন। জনসংখ্যার হিসাবে এখনই চিকিৎসার প্রয়োজন দেশে এরকম মানসিক রোগীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ।

শরীরের মতো মনেরও রোগ হতে পারে। অনেকেই মানসিক রোগ সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে ভ্রান্ত ধারণা, ভীতি, লোকলজ্জা এবং কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার মাধ্যমে বেশিরভাগ মানসিক রোগের নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। দেশের ১৬ কোটি জনগণের বিপরীতে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা মাত্র ২১০ জন। এত অল্প সংখ্যক মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পক্ষে বিপুল জনগোষ্ঠিকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেয়া কষ্টসাধ্য। সে কারণে স্বাস্থ্য বিভাগে মাঠপর্যায়ে কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দকে মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের (সেবিকা ও উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার) জন্য মানসিক স্বাস্থ্য ও মাদকাসক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে সহজ ও সরল ভাষায় প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

ইদানিং বাংলাদেশে মাদকাসক্তি তরুণ সমাজে আশংকাজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকারে পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। এ বিষয়টি লক্ষ্য রেখে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে মাদকাসক্তি বিষয়টি গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আব্দুল হামিদ
পরিচালক ও অধ্যাপক
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সূচিপত্র

১.	ভূমিকা	১
২.	বিষণ্নতা	৫
৩.	বাইপোলার মুড ডিজ্অর্ডার	৯
৪.	সিজোফ্রেনিয়া	১৩
৫.	অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার	১৭
৬.	কনভার্সন ডিসঅর্ডার	২১
৭.	শিশু-কিশোরদের মানসিক সমস্যা	২৫
৮.	অটিজম	২৯
৯.	মাদকাসক্তি	৩৩
১০.	মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ	৩৭

মডিউল ১

ভূমিকা
(Introduction)

কী জানবো:
- মানসিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়?
- বাংলাদেশে মানসিক সমস্যার বিস্তৃতি
- মানসিক সমস্যার ধরণ
- মানসিক রোগ বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

মানসিক সমস্যা কি ?

চিন্তা, আচরণ, ও আবেগের পরিবর্তনের কারণে যদি ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গুণগত মান কমে যায়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক ব্যাহত হয় এবং তার পেশাগত দক্ষতা হ্রাস পায়, তখন তার মধ্যে কোনো মানসিক সমস্যা থাকতে পারে বলে মনে করা হয়।

মানসিক রোগের বিস্তৃতি

২০০৩-২০০৫ইং সালে দেশব্যাপী শহর ও গ্রামে পরিচালিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশে ১৮ বৎসরের উর্দ্ধে জনসংখ্যার ১৬.১ শতাংশ, মানসিক রোগে ভুগছেন। এদের মধ্যে ৮.৪% এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার, ৪.৬% বিষণ্নতা, ০.৬% মাদকাসক্ত ও ১.১% গুরুতর মানসিক রোগে ভুগছেন। মহিলাদের মাঝে ১৮.০৯% এবং পুরুষদের মাঝে ১২.৮৯% মানসিক রোগে ভুগছেন। পরবর্তীতে ২০০৯ইং সালে শিশু-কিশোরদের উপর পরিচালিত আর একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ১৮ বছরের নীচে প্রায় ১৮.৪% মানসিক রোগে ভুগছেন এদের মাঝে ৩.৮% শতাংশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, ২% মৃগীরোগ এবং ০.৮% মাদকাসক্তি সমস্যায় ভুগছেন। জনসংখ্যার হিসাবে দেশব্যাপী বর্তমানে চিকিৎসার প্রয়োজন এমন মানসিক রোগীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ। অনেক মানসিক রোগ আছে যা মনের লক্ষণের চেয়ে শারীরিক লক্ষণের মাধ্যমে বেশি প্রকাশ পায়। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অনির্ধারিত ঔষধ প্রেসক্রিপশন করা হয়। ফলে রোগ ভাল হয় না এবং রোগী বিভিন্ন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। অনেক সময় 'আপনার কোনো রোগ নাই' এই ধরনের কথাও রোগীকে শুনতে হয়।

গুরুত্বপূর্ণ মানসিক রোগসমূহ

১. এ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডারস (অবসেশন বা শুচিবায়ু, ফোবিয়া বা অহেতুক ভীতি)।
২. কনভার্সন ডিসঅর্ডার (হিস্টিরিয়া)।
৩. সিজোফ্রেনিয়া।
৪. ডিপ্রেশন বা বিষণ্নতা রোগ।
৫. বাইপোলার মুড ডিস্অর্ডার।
৬. শিশু-কিশোরদের মানসিক রোগ (অতিমাত্রায় চঞ্চলতা, আচরণগত সমস্যা, বেশী বয়সে বিছানায় প্রস্রাব, অটিজম)।
৭. মাদকাসক্তি।
৮. মৃগীরোগ ও মৃগীরোগজনিত মানসিক রোগ।
৯ বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী।
১০. ডিমেনসিয়া।

মানসিক রোগ বিষয়ে সাধারণ তথ্য

- মানসিক রোগীকে ভয় দেখানো-ধমক দেয়া সঠিক নয়।
- মারধর, সমালোচনা, অতি যত্ন, কম যত্ন মানসিক রোগীর জন্য ক্ষতিকর।
- অস্বাভাবিক আচরণ, অশান্তি, আত্মহত্যার প্রবণতা, অস্থিরতা, মাথা-ব্যথা, শরীর ব্যথা, দাঁত লাগা, যৌন সমস্যা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি মানসিক রোগের সাধারণ লক্ষণ। এধরনের সমস্যা হলে উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।

- বিষণ্ণতা অন্যতম প্রধান মানসিক রোগ। চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- পারিবারিক উৎসব আনন্দ ও কর্মময় জীবন মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি প্রতিরোধ সহায়ক। পারিবারিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করুন।
- বিয়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা নয়। নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে ডাক্তারী চিকিৎসা গ্রহণ করুন।
- সমাজের সকলের মত মানসিক রোগীদেরও রয়েছে সমান অধিকার। মানসিক রোগীর আইনগত অধিকার রক্ষায় সহযোগিতা করুন।
- মানসিক রোগীর ঔষধ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বন্ধ করবেন না। প্রয়োজনে উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- সন্তানদের ভালকাজে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করুন। মাদকাসক্তি প্রতিরোধ করুন।
- আপনার এলাকার স্বাস্থ্য কর্মী, সেবিকা ও চিকিৎসক মানসিক রোগের চিকিৎসা বিষয়ে অবগত আছেন। তাঁদের সাথে যোগাযোগ করুন।
- নিকটস্থ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকাস্থ জাতীয় মানসিক হাসপাতাল ও পাবনা মানসিক হাসপাতালে মানসিক রোগী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। আপনার চিকিৎসকের পরামর্শমত এ সুযোগ গ্রহণ করুন।
- জন্মকালীন মাথায় আঘাত শিশুর মৃগী ও মানসিক রোগের অন্যতম কারণ। নিরাপদ প্রসবের জন্য উপজেলা হাসপাতালে যোগাযোগ করুন।
- পরিবারের সহায়তায় মানসিক রোগীকে কাজে নিয়োগ করুন। তাদের পুনর্বাসনে উদ্যোগ নিন।
- মানসিক রোগ মানেই 'পাগলামি' নয়। শরীরের যেমন রোগ হয় মনেরও তেমনি রোগ হয়, তাই মনোরোগের ডাক্তারী চিকিৎসা নিতে হবে।
- মানসিক রোগীকে 'পাগল' বলবেন না। তাদের 'পাগল' বলা সামাজিক অপরাধ। তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান, চিকিৎসা দিন।
- মনের কারণেই অনেক সময় যৌন সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- বেশিরভাগ আত্মহত্যা ও বিবাহবিচ্ছেদের পেছনে মানসিক সমস্যা দায়ী, দেরি না করে মনোচিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- অনেক মানসিক রোগেরই শারীরিক প্রকাশ রয়েছে, যেমন মাথা ব্যথা।
- অপচিকিৎসা ও কুসংস্কার যেমন- মারধর, পানিপড়া, ঝাঁড়ফুক, তাবিজ-কবজ, মানত ইত্যাদি মানসিক রোগীর ভোগান্তি বাড়ায়।
- পারিবারিক বিশৃঙ্খলা অনেক সময় মাদকাসক্তির কারণ। পারিবারিক শান্তি বজায় রাখুন, সুস্থ থাকুন।
- শিশু-কিশোরদের শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন মানসিক রোগের অন্যতম কারণ, এসব প্রতিরোধ করুন।
- নারী নির্যাতন মানসিক অসুস্থতার কারণ। নির্যাতন বন্ধ করুন, মানসিকভাবে সুস্থ থাকুন।
- প্রবীণদের মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করুন। পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাদের যত্ন নিন।

মডিউল ২

বিষণ্নতা
(Depressive Disorder)

কী জানবো:
- বিষণ্নতা কী
- বিষণ্নতার লক্ষণ, কারণ ও নির্ণয়
- বিষণ্নতার পরিনতি
- বিষণ্নতার চিকিৎসা
- বিষণ্নতার চিকিৎসায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, কেস উপস্থাপন/রোল প্লে, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

বিষণ্নতা (Depressive Disorder)

বিষণ্নতা কি?

বিষণ্নতা একটি সার্বজনীন আবেগ ও অনুভূতি যখন বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত ঘটনা বা বিষয়ের কারণে আমাদের মন খারাপ হওয়ার অনুভূতি হয়। কিন্তু মানসিক রোগ হিসেবে বিষণ্নতা বিষয়টি দৈনন্দিন বিভিন্ন কারণে মন খারাপ হওয়া থেকে ভিন্ন রকমের।

বিষণ্নতা একটি মানসিক রোগ যখন কমপক্ষে ১৪ দিন কোন ব্যক্তির বেশীরভাগ সময় হতাশ ও বিষণ্নতার অনুভূতি হয় এবং সবকিছুর প্রতি অনীহাসহ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। এর ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, শিক্ষাগত, পেশাগত ও সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা ব্যাহত হয়।

কেস/রোল প্লে:

১৯ বছর বয়সী মেয়ে 'ক'। গত এক মাস ধরে তার কিছু ভালো লাগেনা, মন খারাপ থাকে। সে একা একা থাকে, কারো সাথে কথা বলে না। পড়ালেখা করতে ভালো লাগেনা, তাই রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। মাঝে মাঝে সে একা একা কাঁদে। মনে হয় বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই ভালো। রাতে ঘুমালে খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুম আসেনা। সারাদিন শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। মনটা সবসময় হতাশ লাগে। হঠাৎ হঠাৎ মাথা ব্যথা করে।

কাদের হয়?

সাধারণত ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সী নারী-পুরুষের বিষণ্নতা দেখা যায়। তবে শৈশব ও বার্ধক্যেও বিষণ্নতা হয়ে থাকে। মহিলাদের বিষণ্নতা হওয়ার ঝুঁকি পুরুষের দ্বিগুণ। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের শতকরা ৪.৬ ভাগ বিষণ্নতায় আক্রান্ত।

লক্ষণসমূহ:

বিষণ্নতার প্রধান কিছু লক্ষণ থাকলেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর ব্যাপ্তি বৈচিত্র্যময়। হতাশা ও বিষণ্নতা বোধ এবং সবকিছুর প্রতি অনীহা এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এছাড়াও লক্ষণসমূহকে শারীরিক ও মানসিক এ দুভাগে ভাগ করা যায়। আমাদের দেশের রোগীদের একটি বড় অংশ বিষণ্নতার শারীরিক উপসর্গ নিয়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপস্থিত হন।

বিষণ্নতার লক্ষণসমূহ

মানসিক লক্ষণ:

- অশান্তি, হতাশা, বিষণ্নভাব ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, অস্থিরতা।
- আনন্দের ঘটনায় আনন্দিত হওয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়া, কাজে-কর্মে আগের মতো আনন্দ না পাওয়া।
- আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া ও নিজেকে সবসময় হীন, তুচ্ছ বা অকর্মণ্য মনে করা।
- কৃতকর্মের জন্য সবসময় নিজেকে অহেতুক দোষারোপ করা
- ভুলে যাওয়া ও মনোসংযোগ করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া।
- অল্পতে কেঁদে ফেলা ।
- আত্মহত্যার চিন্তা, প্রবণতা ও মরে যাওয়ার ইচ্ছা।
- **অন্যান্য লক্ষণসমূহ:** মাঝে মাঝে রোগী এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে দৈনন্দিন কাজ করার ক্ষমতা (যেমন-আহার, পরিচ্ছন্নতা) থাকে না। কিন্তু অনেক সময় রোগীদের মধ্যে অস্থিরতার প্রবণতাও দেখা যায়।

শারীরিক লক্ষণ:

- **ঘুমের সমস্যা:** অনিদ্রা বা বেশী ঘুম; খুব ভোরে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে প্রায় ২ ঘন্টা আগে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া বিষন্নতার লক্ষণ।
- **খাবারে অরুচি :** অনেক সময় খাদ্য গ্রহণ বেড়ে যায়।
- ওজন কমে যাওয়া (অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে মাঝে মাঝে ওজন বেড়ে যায়)।
- অতিরিক্ত ক্লান্তি বোধ।
- শারীরিক রোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তার পরও মাথাব্যথা ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা।
- মাথা ও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জ্বালাপোড়ার অনুভূতি।
- যৌন আগ্রহ ও ক্ষমতা কমে যাওয়া।

বিষণ্নতার কারণ

বিষণ্নতার কারণ নানাবিধ। এদের মধ্যে বংশগতি বা জিনেটিক কারণ, বিষণ্নতার পারিবারিক ইতিহাস, পূর্বেঘটিত বিষণ্নতা ইত্যাদি অন্যতম। বিষণ্নতায় মস্তিস্কের নিউরোট্রান্সমিটার বা রাসায়নিক পদার্থ নরএড্রেনালিন, সেরোটনিন ও ডোপামিনের ঘাটতি দেখা যায়। দরিদ্র, গৃহহীন, ঋণগ্রস্ত ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিষণ্নতার ঝুঁকি বেশি।

শৈশবে মাতা-পিতা হারানো, মাতা-পিতার মধ্যে বিচ্ছেদ, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন পরবর্তী জীবনের বিষণ্নতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। বিভিন্ন ধরনের শারীরিক রোগে (যেমন ব্রেইন স্ট্রোক, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, মৃগী রোগ) আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বিষণ্নতার ঝুঁকি অন্যদের চেয়ে তিন-চার গুণ বেশি। যেকোনো ধরনের মাদকাসক্তি বিষণ্নতার অন্যতম কারণ।

মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রসবোত্তর, মাসিক চলাকালীন ও রজঃনিবৃতির (মেনোপজ) পর বিষণ্নতা দেখা যায়। এছাড়াও পারিবারিক সহিংসতা, শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন (যেমন, ইভ টিজিং) মহিলাদের ক্ষেত্রে বিষণ্নতার অন্যতম কারণ।

বিষণ্নতার পরিণতি

- বিষণ্নতা নির্ণয় করে চিকিৎসা না করালে কর্মমতা ব্যাহত হয় যার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত, পেশাগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- সময়মত চিকিৎসা করালে রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে
- আত্মহত্যার চিন্তা ও প্রবণতা থেকে আত্মহত্যা ঘটিয়ে ফেলতে পারে এবং জীবনহানি হতে পারে।
- কিছু ক্ষেত্রে বিষণ্নতা ভাল হয়ে গেলেও পুনরায় ও দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।

বিষণ্নতার চিকিৎসা

- প্রাথমিকভাবে সনাক্তকৃত রোগী চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করবেন।
- চিকিৎসক বিষণ্নতারোধী ঔষধ (যেমন এমিট্রিপটাইলিন, ফ্লুঅক্সিটিন, সারট্রালিন, এসসিটালোপ্রাম, প্যারোক্সিটিন, মিট্রাজেপিন) দিয়ে পর্যাপ্ত মাত্রায় ও মেয়াদে রোগীর চিকিৎসা করবেন। মানসিকরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ক্ষেত্রবিশেষে ইলেকট্রোকনভালসিভ থেরাপীর (ECT) মাধ্যমে বিষণ্নতার চিকিৎসা সফল ও নিরাপদভাবে করা সম্ভব।
- বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে।
- রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনের জন্য মানসিক সমর্থন প্রদান করবেন।

বিষণ্নতার চিকিৎসায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

- প্রামমিকভাবে বিষণ্নতার লক্ষণ সমূহ চিহ্নিত করা।
- রোগীদের চিকিৎসকের নিকট প্ররণ করা।

- রোগী ও তার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে ঔষধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা এবং ঔষধের সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (যেমন মুখ শুকিয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিণ্য) সম্পর্কে অবহিত করা।
- ওষুধ খাওয়ার নিয়মাবলী ও কতদিন পর চিকিৎসকের নিকট ফলোআপের জন্য আসবে সে সম্পর্কে জানানো।
- আত্মহত্যার চিন্তা ও প্রবণতা আছে এমন রোগীর নিরাপত্তা সম্পর্কে অভিবাবকদের সতর্ক ও সচেতন করা। বিপদজনক দ্রব্যাদি (যেমন দড়ি, ধাঁরালো অস্ত্র) রোগীর কাছ থেকে দূরে রাখা ও প্রয়োজনে হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
- হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের দৈনন্দিন কাজগুলি (খাওয়া, গোসল) করতে উৎসাহ প্রদান করা।
- রোগীর প্রতি সহযোগিতা ও সমর্থন প্রদানের জন্য অভিভাবকদের পরামর্শ প্রদান।

কখন হাসপাতালে ভর্তি হওয়া জরুরী

- রোগীর নিজের বা অন্যের জীবন যখন হুমকির সম্মুখীন (আত্মহত্যার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়া)।
- খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাওযার কারণে যখন জীবন সংশয় হয়।
- চিকিৎসা জটিলতা বৃদ্ধির কারণে উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে করণীয়: বর্তমানে আত্মহত্যা ও আত্মহত্যার প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে গিয়েছে। আত্মহত্যা প্রচেষ্টাকারীদের বেশীরভাগের বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ থাকে যার মধ্যে বিষণ্নতা, সিজোফ্রিনিয়া, মাদকাসক্তি, ব্যক্তিত্বের সমস্যা ও ইপিলেন্সি অন্যতম। সময়মত মানসিক রোগ নিরুপন করে চিকিৎসা করালে এসবক্ষেত্রে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব। অনেক সময় ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক কারণে কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপনীত হন যে এ ধরনের সংকটময় পরিস্থিতিতে আশাহত হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু এসকল ক্ষেত্রে পারিবারিক সহায়তা ও মানসিকরোগ বিশেষজ্ঞের ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সময়মত মানসিক চিকিৎসা সহায়তা পেলে আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব। আত্মহত্যা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবী।

বিষণ্নতা একটি চিকিৎসাযোগ্য মানসিক রোগ। সময়মত বিষণ্নতা নির্ণয় করে চিকিৎসা প্রদান করলে কর্মদক্ষতা হারানোর বিপূল ক্ষতি রোধ করা ও আত্মহত্যার কারণে জীবনহানি রোধ করা সম্ভব।

মডিউল ৩

বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার
(Bipolar mood disorder)

কী জানবো:
- বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার কী
- বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার এর লক্ষণ, কারণ ও নির্ণয়
- বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার এর পরিনতি
- বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার এর চিকিৎসা
- বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার এর চিকিৎসায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, কেস উপস্থাপন/রোল প্লে, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার (Bipolar mood disorder)

বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার কি?

বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার হচ্ছে একটি আবেগজনিত গুরুতর মানসিক রোগ- যাকে দ্বিপ্রান্তিক মানসিক রোগ বলা যেতে পারে। এ সমস্যার দুই প্রান্তে আবেগের তীব্র বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এক প্রান্তে থাকে বিষন্নতা বা ডিপ্রেশন, যেখানে আবেগের উদ্দীপনা কম থাকে, কোনো কিছুই ভালো লাগে না, দুঃখবোধ হয়। অন্য প্রান্তে থাকে অতি উৎফুল্লতা বা ম্যানিয়া যেখানে আবেগের উদ্দীপনা থাকে বেশি। কোনো ব্যক্তির যদি একবার ম্যানিয়া আর আরেকবার বিষন্নতা হয় তখন তাকে বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার এর রোগী বলে নির্ণয় করা হয়। রোগীর জীবদ্দশায় কখনো ম্যানিয়া আবার কখনো বিষন্নতা দেখা যায়- এবং মাঝখানের সময়টায় সাধারণত রোগী সম্পূর্ণ ভালো থাকে।

কেস/রোল প্লে:

২৭ বছর বয়সী যুবক 'খ'। ইদানিং সে অতিরিক্ত কথা বলছে। নিজেকে অনেক বড় মনে করছে। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি টাকা খরচ করছে। হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে অন্যকে আঘাত করতে যাচ্ছে। বিশ্বাস করে যে তার মধ্যে অস্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে। এর আগে কিছুদিন তার খুব মন খারাপ ছিল, সে কারো সাথে মিশতো না, কথা কম বলতো মন খারাপ করে থাকতো।

কেন হয়?

বহুবিধ কারণে বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার হয় বলে ধারণা করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে- বংশগত বা জেনেটিক কারণ, মানসিক রোগের পারিবারিক ইতিহাস, মস্তিস্কে নরএড্রেনালিন, সেরোটনিন, ডোপামিন জাতীয় বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটারের (এক ধরণের রাসায়নিক উপাদান) ভারসাম্যহীণতা, তীব্র মনোসামাজিক চাপ, স্নায়বিক সমস্যা, নেশাজাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ ইত্যাদি ।

কাদের হয়?

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায় প্রতি ১০০০ জন মানুষের মধ্যে ৩ থেকে ১৫ জন মানুষের মধ্যে এ রোগটি রয়েছে। বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত এক জরীপের প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় গবেষণায় অংশ নেয়া প্রতি ১০০০ জন মানুষের মধ্যে ৪ জন বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত। নারী-পুরুষ উভয়েরই আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা সমান। সাধারণত ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে এ রোগের লক্ষণ শুরু হয়, তবে যে কোনো বয়সেই এমনকি শিশুদের এবং বৃদ্ধ বয়সেও এ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারের লক্ষণ

এ সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তির কখনো বিষন্নতা থাকবে আবার কখনো অতি উৎফুল্লতা (ম্যানিয়া) থাকবে। মাঝের সময়টা সে সাধারণত সুস্থ্য থাকে তবে কখনো কখনো একাদিক্রমে বিষন্নতার পর ম্যানিয়া বা ম্যানিয়ার পর বিষন্নতা থাকতে পারে।

বিষন্নতার প্রধান লক্ষণগুলো হচ্ছে [বিস্তারিত মডিউল ২]:

মানসিক লক্ষণ:

- অশান্তিবোধ, হতাশা, মন খারাপ থাকা
- আনন্দদায়ক বিষয় ও ঘটনায় আনন্দ না পাওয়া

- আত্মবিশ্বাস কমে আওয়া, নিজেকে হীণ, তুচ্ছ অকর্মণ্য মনে করা
- নিজেকে দোষী ভাবা, অপরাধবোধে আক্রান্ত হওয়া
- মনে রাখতে না পারা, কোনো বিষয়ে মন:সংযোগ করতে না পারা
- কান্নাকাটি করা
- আত্মহত্যার চিন্তা, প্রবণতা ও মরে যাওয়ার ইচ্ছা
- দৈনন্দিন স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যহত হওয়া।

শারীরিক লক্ষণ:

- ঘুমের সমস্যা- সাধারণত খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়া
- ক্ষিদে কমে যাওয়া বা কখনো অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ
- ওজন কমে যাওয়া বা ওজন বেড়ে যাওয়া
- শরীরের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা ও মাথাসহ শরীরে জ্বালাপোড়া
- যৌনস্পৃহা কমে যাওয়া
- কোষ্ঠকাঠিন্য
- অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ
- নারীদের ক্ষেত্রে মাসিকের সমস্যা

কমপক্ষে দুই সপ্তাহ ধরে বিষন্নতার লক্ষণ থাকলে তবে রোগীর বিষন্নতা রোগ আছে বলে নির্ণয় করা হয়।

ম্যানিয়ার প্রধাণ লণগুলো হচ্ছে:

- অতি উৎফুল্ল থাকা, মনে সবসময় স্ফুর্তি আর আনন্দ অনুভব করা, খিঁটখিঁটে মেজাজ অথবা রাগান্বিত ভাব।
- অতিরিক্ত ও দ্রুত উচ্চস্বরে বেশি বেশি কথা বলা।
- নিজের সম্পর্কে অযৌক্তিকভাবে উঁচু ধারণা পোষণ করা, নিজেকে বড় মনে করা।
- অতি দ্রুত চিন্তার ক্ষেত্র পরিবর্তন করা।
- অতিরিক্ত কর্মতৎপর হয়ে যাওয়া, শরীরে ও মনে অতিরিক্ত শক্তি ও ক্ষমতা অনুভব করা।
- মন:সংযোগ কমে যাওয়া
- অতিরিক্ত খরচ করা।
- হঠাৎ করে রেগে যাওয়া, উত্তেজিত হয়ে অন্যকে আঘাত করা, ভাংচুর করা।
- অপ্রাসঙ্গিকভাবে গান গাওয়া, নাচা ইত্যাদি।
- বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাস (ডিল্যুশন) ও অলীক প্রত্যয়ণ (হ্যালুসিনেশন) কখনো কখনো থাকতে পারে।
  ম্যানিয়া নির্নয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণসমূহ কমপক্ষে এক সপ্তাহ থাকতে হবে।

বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার নির্ণয়:

এরোগের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষনসমূহ অল্প সময়ের জন্য কারো মধ্যে দেখা গেলেই ধরে নেয়া যাবে না যে তার বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার আছে। এ রোগ নির্ণয়ের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই। কেবলমাত্র মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মানসিক স্বাস্থ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণই সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করতে পারবেন কারো মধ্যে বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার আছে কিনা।

বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারের পরিণতি:

সঠিক সময়ে রোগটি নির্ণীত হলে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করলে এসব রোগীরা সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। তবে যথাযথ চিকিৎসা না পেলে এ ধরণের রোগী একাধারে পরিবার ও সমাজের বোঝা হয়ে উঠে এবং সম্পদ বিনষ্টসহ আত্মহত্যা বা অপরকে হত্যার মত দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার আছে এমন রোগীদের মধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার প্রবণতা অন্যদের চাইতে বেশি। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে নিয়মিত এ রোগের চিকিৎসা করানো জরুরী।

চিকিৎসা:

বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারের চিকিৎসার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্তঃবিভাগে ভর্তি করে রোগীর চিকিৎসা দেয়া হয়, তবে অবস্থা অনুযায়ী বহির্বিভাগেও চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে। ওষুধের পাশাপাশি পারিবারিক সাহায্য সহযোগিতা, সামাজিক সমর্থন, পুনর্বাসন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এ রোগের চিকিৎসায় মুড স্ট্যাবিলাইজার জাতীয় ওষুধ পর্যাপ্ত মেয়াদ ও পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। এসকল ওষুধের মধ্যে রয়েছে- লিথিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম ভালপ্রোয়েট, কার্বামাজেপিন, ল্যামোট্রিজিন ইত্যাদি। এছাড়া ম্যানিয়ার ক্ষেত্রে এন্টিসাইকোটিক ও বিষণ্নতার ক্ষেত্রে এন্টিডিপ্রেসেন্ট জাতীয় ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া প্রয়োজনে ঘুমের ওষুধ দেয়া যেতে পারে। কোনো কোনো ওষুধের ক্ষেত্রে (লিথিয়াম কার্বনেট) নির্দিষ্ট সময় পরপর রক্তের কিছু পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে। কখনো কখনো ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি (ইসিটি) দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারে সনাক্ত ও চিকিৎসায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করনীয়:

- প্রাথমিকভাবে বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডারের লক্ষণগুলো চিহ্নিত করবেন
- সনাক্তকৃত রোগীদের তাৎণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবেন এবং প্রয়োজনে নিকটস্থ চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠাবেন।
- চিকিৎসক কর্তৃক বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার নির্ণীত হলে রোগী ও তার স্বজনদের রোগটি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য প্রদান করবেন এবং চিকিৎসা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- নিয়মিত ওষুধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করবেন।
- ক্ষেত্রবিশেষে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (শরীরে ফুসকুঁড়ি উঠা, অতিরিক্ত দুর্বল হয়ে যাওয়া, ঘাড়-হাত-পা শক্ত হয়ে যাওয়া, মুখ দিয়ে লালা ঝরা, ইত্যাদি) ও তার প্রতিকার বিষয়ে রোগী ও তার স্বজনদের অবহিত করবেন।
- আত্মহত্যা, হত্যা বা অন্যকে আঘাত করার প্রবণতা আছে এমন রোগীদের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতামূলক তথ্য রোগীর স্বজনদের জানাবেন এবং এ বিষয়ে সচেতন করে তুলবেন।

মডিউল ৪

সিজোফ্রেনিয়া
(Schizophrenia)

কী জানবো:
- সিজোফ্রেনিয়া কী
- সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ, কারণ ও নির্ণয়
- সিজোফ্রেনিয়ার পরিনতি
- সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা
- সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, কেস উপস্থাপন/রোল প্লে, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)

সিজোফ্রেনিয়া কি?

সিজোফ্রেনিয়া হচ্ছে একটি গুরুতর মানসিক রোগ যেখানে একজন ব্যক্তির চিন্তা, আচরণ ও প্রত্যণের (perception) অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। পারিপার্শ্বিকতার প্রতি- আক্রান্ত ব্যক্তির ধারণা পরিবর্তিত হয় এবং তার মধ্যে অমূলক বিশ্বাস জন্মায়। সিজোফ্রেনিয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী রোগ। এ রোগের কারণে তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও কর্মক্ষেত্রে স্বাভাবিক সম্পর্ক ও কর্মকান্ডসমূহ ব্যাহত হয়।

কেন হয়?

নানাবিধ কারণে সিজোফ্রেনিয়া হয় বলে ধারণা করা হয়। যেমন- বংশগত বা জেনেটিক কারণ, মস্তিস্কে ডোপামিন, সেরোটনিন জাতীয় বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটারের (এক ধরণের রাসায়নিক উপাদান) পরিমানগত ও গুণগত পরিবর্তন, তীব্র মনোসামাজিক চাপ, স্নায়বিক সমস্যা ইত্যাদি ।

কেস/রোল প্লে:

২৫ বছর বয়সী যুবক 'গ'। ইদানিং তার আচরণ ও চিন্তায় নানা অস্বাভাবিকতা দেখা দিচ্ছে। সে একা একা বিড়বিড় করে, নিজের যত্ন নেয়না। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে। মাঝে মাঝে সে কানে এমন সব মানুষের কথা শুনতে পায় যারা আশে পাশে নেই। সে জানায় ঐ মানুষেরা তার বিষয়ে নানা কথা বলে। 'গ' মনে করে আশে পাশের অনেকেই তার কোনো ক্ষতি করতে চায়, এজন্য সবাইকে সে সন্দেহ করে, সে মনে করে তার আপনজনদেন মধ্যে কেউ তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে। তার আরো মনে হয় যে অন্যেরা তার মনের চিন্তা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। তার ঘুম ঠিকমত হয় না।

কাদের হয়?

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা যায় প্রতি ১০০০ জন মানুষের মধ্যে ২ থেকে ১১ জন মানুষের মধ্যে এ রোগটি রয়েছে। বাংলাদেশে এ সংক্রান্ত এক জরীপে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় গবেষণায় অংশ নেয়া প্রতি ১০০০ জন মানুষের মধ্যে ৬ জন এ রোগে আক্রান্ত। নারী-পুরুষ উভয়েরই সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা সমান। সাধারণত ১৫ থেকে ৫৪ বছর বয়সের মধ্যে যেকোনো সময় এ রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণ:

সিজোফ্রেনিয়ার নানাবিধ লক্ষণ দেখা যায়। তবে কোনো লক্ষণ অল্প সময়ের জন্য কারো মধ্যে দেখা গেলেই ধরে নেয়া যাবে না তার সিজোফ্রেনিয়া আছে। সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে একমাসব্যাপী লক্ষণগুলো উপস্থিত থাকতে হবে। সিজোফ্রেনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষনগুলো হচ্ছে-

- **চিন্তার অস্বাভাবিকতা:** যুক্তিযুক্ত চিন্তা করতে পারেনা, অবাস্তব অলীক চিন্তা করে। চিন্তার ধারাবাহিকতা হারিয়ে ফেলে, এক চিন্তা থেকে দ্রুত অপ্রাসঙ্গিকভাবে অন্য চিন্তা করা। মনে করতে পারে যে তার চিন্তা অন্য কেউ নিয়ে যাচ্ছে বা রেডিও টিভির মাধ্যমে তার চিন্তা সবাই জেনে যাচ্ছে। আবার কেউ বিশ্বাস করেন যে তার চিন্তার মধ্যে অন্য কারো চিন্তা অনুপ্রবেশ করছে। কোনো বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাস বা ডিল্যুশন দেখা দিতে পারে।
- **হ্যালুসিনেশন (Hallucination) বা (অলীক প্রত্যক্ষণ):** কোনো ধরণের উদ্দীপনার উপস্থিতি ছাড়াই তা প্রত্যণ করা। যেমন ঘরে যাদের উপস্থিতি নেই -কানে তার বা তাদের কথা শোনা (গায়েবী আওয়াজ), সামনে কিছু নেই অথচ কিছু দেখা, গায়ে কিছুর স্পর্শ অনুভব করা। সিজোফ্রেনিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত রোগী জানান যে এক বা একাধিক ব্যক্তি তাকে নিয়ে, তার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলেন এবং তিনি তা শোনেন বলে বিশ্বাস করেন। অথচ বাস্তবে তাদের কারো উপস্থিতি নেই।

- **অহেতুক সন্দেহ:** কোনো কারন ছাড়াই অন্যকে সন্দেহ করা এই সন্দেহ হতে পারে বিশেষ ব্যক্তির প্রতি বা আশেপাশের সবার প্রতি। রোগী মনে করে অন্যেরা তার ক্ষতি করতে চায়, তার খাবারে বিষ মেশাতে চায়, তাকে নিয়ে নানা বদনাম রটাতে চায় ইত্যাদি।
- **বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হওয়া:** মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করতে পারে যে তার চিন্তা, আচরণ কোনো কিছুই তার নিজের নয়, অন্য কেউ বা বাইরের কোনো শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।
- **নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা :** অন্যের সাথে কথা বলতে চান না-নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকেন। অনেক সময় খুব কম কথা বলেন, অন্যের চোখে চোখ রেখে তাকান না। কোনো কাজে উৎসাহ বোধ না করা, আবেগের অনুভূতিগুলো কমে যাওয়া ইত্যাদি লণও দেখা দেয়।
- কথা ও আচরণে অস্বাভাবিকতা
- **নিজের মনের কথা শোনা:** অনেক সময় নিজে নিজে যা ভাবছেন তা নিজকানে শুনতে পান।
- **অহেতুক উত্তেজনা :** কখনো কোনো কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠা।
- **একা একা কথা:** অনেক সময় একা একা কথা বলে বা একা একা কোনো কারণ ছাড়াই হাসে বা কাঁদে।
- **ঘুমের সমস্যা:** ঘুম না হওয়া ইত্যাদি।
- **সমস্যাটিকে অস্বীকার করা:** তার মধ্যে যে কোনো মানসিক সমস্যা আছে এটা তিনি স্বীকারই করতে চান না।
- **স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত:** ব্যক্তিগত, সামাজিক, এবং কর্মক্ষেত্রসহ সর্বত্র তার স্বাভাবিক কর্মকান্ড ব্যাহত হয়।

সিজোফ্রেনিয়া নির্ণয়:

সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো বা এর এক বা একাধিক লক্ষন অল্প সময়ের জন্য কারো মধ্যে থাকলেই ধরে নেয়া যাবে না যে তার সিজোফ্রেনিয়া আছে। আরো মনে রাখতে হবে যে সিজোফ্রেনিয়া নির্ণয়ের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই। কেবলমাত্র মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এবং মানসিক স্বাস্থ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণই সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করতে পারবেন কারো মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া আছে কিনা। সিজোফ্রেনিয়া একটি গুরুতর মানসিক সমস্যা- তাই রোগীর স্বার্থে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা জরুরী।

সিজোফ্রেনিয়ার পরিণতি:

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষনায় দেখা যায় সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় ও উপযুক্ত চিকিৎসা এবং অন্যান্য সহায়ক পরিচর্যা পেলে এক তৃতীয়াংশ রোগী প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে এবং কর্মম হয়ে উঠে। আর এক তৃতীয়াংশ রোগী চিকিৎসা নির্ভর হয়ে মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপনের উপযোগী হয় কিন্তু প্রায় সারা জীবন তাকে ওষুধ ও অন্যন্য চিকিৎসার উপর নির্ভর করতে হয়। আর বাদবাকি এক তৃতীয়াংশ রোগী সব ধরণের চিকিৎসা ও সহায়তা পাবার পরও স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করতে পারে না, তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়।

সঠিক সময়ে রোগটি চিহ্নিত হলে এবং যথাযথ চিকিৎসা পেলে সিজোফ্রেনিয়া রোগী অন্য সবার মত প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন।

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসা:

সিজোফ্রেনিয়ার চিকিৎসার জন্য বহির্বিভাগে এবং প্রয়োজনে অন্তঃবিভাগে ভর্তি করে রোগীর চিকিৎসা দেয়া হয়। সিজোফ্রেনিয়া চিকিৎসায় এন্টিসাইকোটিক জাতীয় ওষুধ পর্যাপ্ত মেয়াদ ও পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়। এসকল ওষুধের মধ্যে রয়েছে- হ্যালোপেরিডল, ক্লোরপ্রোমাজিন, ট্রাইফ্লুপেরাজিন, রিসপেরিডন, ক্লোজাপিন ইত্যাদি। এছাড়া ফ্লুফেনাজিন ডিকানয়েট জাতীয় দীর্ঘ সময় ধরে কার্যকর থাকে এমন ইঞ্জেকশনও প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া ওষুধের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য প্রোসাইক্লিডিন এর ব্যবহার করা হয়। কোনো কোনো ওষুধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়

পরপর রক্তের কিছু পরীক্ষা করার প্রয়োজন হতে পারে। ওষুধের পাশাপাশি পারিবারিক সাহায্য সহযোগিতা, সামাজিক সমর্থন, পুনর্বাসন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোকনভালসিভ থেরাপি (ইসিটি) দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

সিজোফ্রেনিয়া সনাক্ত ও চিকিৎসায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করনীয়ঃ

- প্রাথমিকভাবে সিজোফ্রেনিয়ার লক্ষণগুলো চিহ্নিত করবেন
- সনাক্তকৃত তাৎক্ষণিকভাবে প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়ে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবেন এবং প্রয়োজনে রোগীদের চিকিৎসাকেন্দ্রে পাঠাবেন।
- চিকিৎসক কর্তৃক সিজোফ্রেনিয়া নির্ণীত হলে রোগী ও তার স্বজনদের রোগটি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য প্রদান করবেন এবং চিকিৎসা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- নিয়মিত ওষুধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করবেন।
- ক্ষেত্রবিশেষে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (ঘাড়-হাত-পা শক্ত হয়ে যাওয়া, মুখ দিয়ে লালা ঝরা, চোখে ঝাপসা দেখা, কোষ্ঠকাঠিণ্য ইত্যাদি) ও তার প্রতিকার এবং ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোধের জন্য চিকিৎসক কর্তৃক যে ওষুধ দেয়া হবে বিষয়ে রোগী ও তার স্বজনদের অবহিত করবেন।
- আত্মহত্যা, এবং অন্যকে হত্যা বা আঘাত করার প্রবণতা আছে এমন রোগীদের বিষয়ে বিশেষ সতর্কতামূলক তথ্য রোগীর স্বজনদের জানাবেন এবং এ বিষয়ে সচেতন করে তুলবেন।
- এই রোগের লক্ষণকে অনেক সময় অজ্ঞতাবশত জ্বীন-পরীর আছর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়টি নিয়ে রোগীর স্বজন এবং সমাজের অপরাপর সকলকে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকৃত তথ্য প্রদান করা।
- সিজোফ্রেনিয়া একটি গুরুতর মানসিক সমস্যা, তবে উপযুক্ত চিকিৎসা ও সহায়তা পেলে এ রোগে আক্রান্ত একজন রোগী সুস্থ্য স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারেন এবং ফিরে আসতে পারেন সমাজের মূল স্রোতে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মরত সকলকে যথাযথ ভূমিকা পালন করে যেতে হবে, তৈরি করতে হবে সার্বিক সচেতনতা।

মডিউল ৫

অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার
(Anxiety disorder)

কী জানবো:
- অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার কী
- গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের লক্ষণ
- অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের চিকিৎসায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, কেস উপস্থাপন/রোল প্লে, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার (Anxiety disorder)

অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার (Anxiety disorder) কী ?

Anxiety disorder এক ধরনের মানসিক রোগ, যেখানে মানসিক উদ্বেগই হল প্রধান লক্ষণ। অ্যাংজাইটি হলো কোনো শারীরিক কারণ ছাড়াই সার্বক্ষণিক উদ্বিগ্ন থাকা।

কাদের হয়?

মানসিক রোগীদের মধ্যে এই ধরণের রোগীর সংখ্যা বেশি। নারী-পুরুষ সবারই হতে পারে তবে নারীদের এই রোগে আক্রান্তের হার তুলনামূলক ভাবে বেশি হয়।

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি Anxiety disorder

১. অতি উদ্বেগ/অস্বভাবিক দুশ্চিন্ত রোগ (Generalized anxiety disorder)
২. শূঁচীবাই (Obsessive-compulsive disorder)
৩. অহেতুক ভীতি (Phobic disorder)
৪. প্যানিক ডিজঅর্ডার (Panic disorder)
৫. পিটিএসডি (Post tramitic stress disorder)

Generalized anxiety disorder (GAD)

কম-বেশি উদ্বেগ সবারই থাকে তবে যদি উদ্বেগ সার্বক্ষণিক দীর্গ-স্থায়ী হয়, ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন ব্যহত করে, তাহলে তাকে GAD বলে।

লক্ষণ:

১. একটা অজানা আশংকা থাকে, এক ধরনের উদ্বেগ ও বিরক্তিকর ভাবনা থাকে।
২. খিটমিটে ও বিরক্তিকর মেজাজ
৩. মনোযোগের অভাব
৪. অগ্রীম উৎকণ্ঠা
৫. অস্থির লাগা

কেস/রোল প্লে: (শূঁচীবাই)

১. জনাব 'ম' সাহেব বহুজাতিক কোম্পানির হিসাবরক্ষক। চলছিল ভালই- একদিন তার মাথায় প্রশ্ন এলো- পৃথিবীতে যে হারে মানুষ বাড়ছে তাতে করে একসময় পৃথিবীর তাবৎ সম্পদ শেষ হয়ে যাবে- তখন মানুষ বাঁচবে কী করে? এ চিন্তা কেউ তার মনে ঢোকায়নি এর উদ্ভব হয়েছে নিজেরই মনে। কিছু সময় পরে তিনি বুঝতে পারলেন এ প্রশ্নটা তার কাছে নিরর্থক এবং এ সব চিন্তা করে তার নিজের বা তার পরিবারের বা তার কোম্পানির কোনো লাভ হবে না- তাই এসব চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু দেখা গেল কি অফিসে- কি বাসায় বা গাড়িতে সবখানে তার মাথায় এই একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে চাইলেন কিন্তু এ চিন্তা যেন তাকে ছাড়ছে না- ফলে যতক্ষণ জেগে আছেন অন্য কোনো দিকে তিনি মন দিতে পারছেন না।

২. মিসেস 'স' এর সমস্যা হচ্ছে তিনি ময়লা লাগার ভয়ে হাত দিয়ে টাকা পয়সা ধরেন না, কিন্তু না ধরেও তো থাকা যায় না, তাই একবার যদি ভুলক্রমে বা নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাত দিয়ে টাকা ধরে ফেলেন, তা একেবারে চকচকে নতুন ব্যাংকনোট বা ছেড়াফাটা ময়লা টাকা যাই হোক না কেন এরপর শুরু হয় তার হাত ধোয়ার পালা- একবার দু'বার নয় কমপক্ষে দশ থেকে পনের বার তিনি সাবান-ডেটল ইত্যাদি দিয়ে বারবার হাত ধোবেনই ধোবেন। এতবার হাত ধোয়ার যে কোনো দরকার নেই- নিতান্তই বাড়াবাড়ি তা তিনি নিজেও বুঝেন- নিজেও চাননা এতবার হাত ধুতে কিন্তু বহুবার হাত না ধুয়ে তিনি থাকতেই পারেন না।

দৈহিক লক্ষণ

বুক ধড়ফর, বুকে ব্যাথা, মাথাব্যাথা, শ্বাসকষ্ট, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, ঘনঘন প্রসাবের বেগ হওয়া, হাত-পা কাপুনি, ঘুমের সমস্যা, ঘাড় ব্যাথা, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসা, সেক্সেও সমস্যা হয় ইত্যাদি।

কারণ

বংশগত কারণ, সেরোটনিন গাবা ও নরএডরেনলিন তারতম্য, ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা, পারিবারিক কলহ, বৈহিক সমস্যা, ব্যবসা বাণিজ্যের সমস্যা, আর্থিক ক্ষতি, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, প্রেমে ব্যর্থতা, দুর্ঘটনা, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতকূল অবস্থা ইত্যাদি।

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়:

রোগ সনাক্ত করে রোগীকে পরামর্শ দেওয়া যেমন- হালকা ব্যায়াম, হাটাহাটির ব্যবস্থা থাকা, কাজে-কর্মে অংশগ্রহণ করা। আর ঔষধ হিসেবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বেনজোডায়াজিপিন, প্রোপানোলল, কম মাত্রায় এন্টি ডিপ্রেসান, কম মাত্রায় এন্টিসাইকোটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। রেনজোডায়াজিপিন গ্রুপের ঔধধ দীর্ঘদিন কায়ো উচিত নয়।

শুঁচীবাই (Obsessive-compulsive disorder)

দুটি অংশ একটি অবশেসশন অপরটি কম্পালশন সাধারণ অবশেসনের মধ্যে বারবার অপ্রয়োজনীয় একই চিন্তা, কোনো বাক্য, কোনো কাহিনী, কোনো ছবি মনে আসে বা রোগীরা মাথা থেকে সরাতে পারে না এবং বিরক্তবোধ করে। সাধারণ কম্পালশনের মধ্যে বারবার হাত ধোয়া, চেক করা ইত্যাদি।

সাধারণত নিচের সমস্যাগুলো বেশি থাকে-

১. **জীবানু বা ময়লা সংক্রমণের ভয় :** এর মধ্যে সাধারণত জীবাণু, ময়লা ও প্রস্রাব ইত্যাদি। ময়লা লেগে আছে এই ভাবনায় বার বার হাত ধুয়ে অনেকে হাত ঘাত করে ফেলে। আবার কেউ কেউ জীবাণুর ভয়ে ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে না।
২. **চেকিং অভ্যাস :** কোনো কিছু বারবার চেক করার প্রবণতা। যেমন-গ্যাসের চুলা নেভানো হলো কি না ? ফ্যান বন্ধ করেছে কিনা, ঘরে কিংবা দোকানে তালা লাগানো হয়েছে কিনা ? ইত্যাদি।

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

রোগীকে আশ্বস্থ করা যে, শুঁচীবাই কোনো বড় ধরনের মানসিক রোগ নয়। ক্লোমিপ্রামিন ও SSRI জাতীয় ঔষধ সেবন ও বিহেভিয়ার (Exposure x Response Prevention) থেরাপির মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করা সম্ভব।

অহেতুক ভীতি (Phobic disorder)

অহেতুক ভীতির কারণে রোগীর মধ্যে বিভিন্ন শারীকি মানসিক লক্ষণ তৈরি হয়।

লক্ষণ:

১. অযৌক্তিক ভয়
২. ভীতির উৎস, জায়গা ইত্যাদি এড়িয়ে চলা
৩. অহেতুক ভীতির কারণে রোগীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যহত করা

প্রকার :

১. বাইরে যাওয়ার ভীতি (Agoraphobia)
২. সামজিক ভীতি (Social Phohia)
৩. সাধারণ ভীতির (Simple Phobia) মধ্যে

ক. উঁচু স্থানে ভয়
খ. তেলাপোকা, টিকটিকি
গ. বন্ধ ঘরের ভয়
ঘ. উড্ডয়নের ভয়

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয় :

ভীতির উদ্রেক করে এমন বিষয় বা অবস্থার বেশি বেশি মুখোমুখি হওয়া ভয়ের জায়গায় বেশি বেশি যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। SSRI ও Imipramine নামক ঔষধ খাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া।

প্যানিক ডিজঅর্ডার (Panic disorder)

লক্ষণ :

১. হঠাৎ করে বুক ধড়ফড় করা, শ্বাসকষ্ট দেখা দেওয়া, মাথা ঝিমঝিম করা
২. দম বন্ধ হয়ে আসা, হাঁপানি রোগীর মত বড় বড় করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া
৩. হাত-পা অবশ হয়ে আসা, শরীরের কাঁপুনি হওয়া
৪. বুকের মধ্যে চাপ ও ব্যাথা অনুভব করা
৫. মৃত্যু ভয় দেখা দেওয়া, মনে হয় যেন এখনই মরে যাবেন
৬. নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা
৭. দূরে কোথাও গেলে স্বজনদের কাউকে সাথে নিয়ে যাওয়া, যেন মাঝখানে অনুস্থ হলে সাহায্য করতে পারে
৮. জামাতে নামাজ পড়তে গেলে একপাশে দাঁড়ায় যেন অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি বের হতে পারে।
৯. রোগীদের মধ্যে ভয় কাজ করে, এই বুঝি আবার একটি অ্যাটাক হতে পারে।
১০. হঠাৎ করে শুরু হয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আছে।

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয় :

রোগীকে আশ্বস্থ করা যে, সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে এসব রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময়ান্তে মনোচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া, Relaxation ট্রেনিং দেওয়া। রোগীকে বুঝানো যে, এটা সাধারণত হার্টের অসুখ নয়। SSRI ও Imipramine নামক ঔষধ খাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া।

মডিউল ৬

কনভারশন ডিসঅর্ডার (Conversion Disorder)

কী জানবো:
- কনভার্সন ডিসঅর্ডার কী
- কনভার্সন ডিসঅর্ডারের লক্ষণ ও কারণ
- কনভার্সন ডিসঅর্ডারের চিকিৎসা
- কনভার্সন ডিসঅর্ডারের চিকিৎসায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, কেস উপস্থাপন/রোল প্লে, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

কনভারশন ডিসঅর্ডার (Conversion Disorder)

কনভারশন ডিজঅর্ডার (হিস্টিরিয়া) কি?

কনভারশন ডিসঅর্ডার (Conversion Disorder) ও ডিসোসিয়েটিভ ডিস্‌অর্ডার (Dissociative Disorder) আমাদের দেশে মূলত হিস্টিরিয়া (Hysteria) নামেই বেশী প্রচলিত। এ মানসিক রোগটি আমাদের দেশে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত পরিচিত একটি সমস্যা।

'কনভারশন' (Conversion) এর বাংলা শাব্দিক অর্থ 'রূপান্তর' বা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন। যেকোন কারণে যখন মনের ভিতর চেপে রাখা কোন মানসিক কষ্ট হঠাৎ করে বিভিন্ন ধরণের শারীরিক/স্নায়বিক উপসর্গরূপে প্রকাশিত হয়, তখন তাকে কনভারশন ডিস্‌অর্ডার বলে।

এক্ষেত্রে শারীরিক উপসর্গের কোন আভ্যন্তরীণ শারীরিক কারণ থাকে না বরং উপসর্গসমূহ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তির মানসিক চাপ বা দ্বন্দ্বের কারণেই হয়ে থাকে।

কাদের হয়?

সাধারণত যাদের মানসিক দ্বন্দ্ব ও চাপ মোকাবেলা করার দক্ষতা তুলনামুলকভাবে কম থাকে, তাদের মধ্যে এ রোগ বেশি দেখা যায়।

কম বয়সের ছেলেমেয়ে ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশি। তুলনামূলকভাবে মহিলাদের এ রোগের প্রকোপ পুরুষেদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে।

কেস/রোল প্লে:

১. ১৫ বছর বয়সী ছেলে 'ত', একদিন ঘুম থেকে উঠার পর দেখা গেল যে সে কথা বলতে পারছেনা। সবাইকে ইশারা ইংগিত করে বোঝাচ্ছে তার গলায় যেন কি হয়েছে - তাতে সে কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে অপারগ। বাবা মা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেল বাসার পাশের একটি ক্লিনিকে- সেখানকার ডাক্তাররা তাকে নানাভাবে পরীক্ষা করে পরামর্শ দিলো একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানোর- বাবা মা কপাল কুঁচকে ঐদিন বিকেলেই তাকে নিয়ে গেলেন একজন সাইকিয়াট্রিস্ট এর কাছে- সেখানে ডাক্তারের সব কথার উত্তর 'ত' কাগজে লিখে লিখে দিল, মুখ খুলল না। সাইকিয়াট্রিস্ট পর পর তিনদিন দীর্ঘক্ষণ তার সাথে একাকী সময় দিলেন, এবং এরপর সে আবার আগের মত কথা বলা শুরু করল।

২. সামনেই এসএসসি পরীক্ষা 'ম' এর, পরীক্ষার দিন চারেক আগে এক বিকেলে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল এবং কিছুক্ষণ পর দেখা গেল তার ডান হাত অবশ হয়ে গেছে- মোটেই নাড়াতে পারছে না - পরীক্ষা দেয়াতো দূরের কথা হাত দিয়ে সামান্য কলমটাও তুলতে পারছে না সে- যথারীতি সাইকিয়াট্রিস্ট এর চিকিৎসার পর দেখা গেল তার হাত আবার আগের মত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

কনভারশন ডিসঅর্ডারের (হিস্টিরিয়া) লক্ষণসমূহঃ

কনভারশন ডিস্‌অর্ডার অর্থাৎ মানসিক কষ্টের শারীরিক প্রকাশ নানাভাবে হতে পারে। এ ধরণের উপসর্গ হঠাৎ করে ঘটে এবং এক্ষেত্রে চিকিৎসক সমস্ত শারীরিক ও ল্যাবরেটরী পরীক্ষায় শরীরের অর্ন্তগত কোন কারণ পান না।

লক্ষণসমূহ:

- বারবার খিঁচুনী হওয়া, ফিট-পরা, হাত-পা বেঁকে যাওয়া, মাথায় অস্বাভাবিক যন্ত্রণা, শ্বাস কষ্ট , দাত লাগা ইত্যাদি।
- হঠাৎ করে কথা না বলতে পারা, চোখে না দেখতে পাওয়া, কানে শুনতে না পারা, শরীরে ব্যথা বা স্পর্শের অনুভূতি পাওয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়া, হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া, প্রসাব আটকে যাওয়া ইত্যাদি।
- হঠাৎ করে শরীরের কোন অঙ্গের কর্মমতা লোপ পাওয়া, যেমন- হাটতে না পারা, হাত দিয়ে কোন কাজ না করতে পারা, গিলতে না পারা ইত্যাদি।

- অনেকক্ষেত্রে রোগী অস্বাভাবিক আচরণ করতে পারে যেমন হঠাৎ পরিচিত জনকে চিনতে না পারা, কোন বিশেষ ঘটনা মনে করতে না পারা, এলোমেলো কথা বলা, অকারণে হাসা, গান গাওয়া, গায়েবী কথা শুনা ইত্যাদি। এসব লক্ষণকে অনেকে 'জ্বীন ভুতের আছর', 'খারাপ বাতাস লাগা' ইত্যাদির মনে করেন যা সম্পূর্ণ ভুল ধারনা।

উপরোক্ত উপসর্গসমূহের মধ্যে যেকোন একটা অথবা কয়েকটি উপসর্গ একসাথে হতে পারে।

যদিও কন্‌ভারশন ডিসঅর্ডারের কোন শারীরিক কারণ থাকে না, কিন্তু এই রোগের লক্ষণসমূহের প্রকাশ রোগীর ইচ্ছাকৃত নয়।

কি কারণে কনভারশন ডিস্‌অর্ডার (হিস্টিরিয়া) হয়?

- কনভারশন ডিস্‌অর্ডার বা হিস্টিরিয়া রোগের মূল কারণ সম্পূর্ণই মানসিক। পুর্বেই বলা হয়েছে কোন ব্যক্তি যদি তার মনের ভিতরের অবদমিত (চেপে রাখা) কোন চাপ, দ্বন্দ্ব, কষ্ট মোকাবেলা করতে না পারে, বা ব্যক্তি যা মন থেকে মেনে নিতে পারে না কিন্তু মেনে নিতে বাধ্য হয়, তবে তা শরীরের মাধ্যমে বিভিন্ন উপসর্গের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।
- এক্ষেত্রে মানসিক দ্বন্দ্ব বা চাপ নানা ধরনের হতে পারে। যেমন- সম্পর্কজনিত দ্বন্দ্ব, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, স্বামী বিদেশে থাকা, আসন্ন পরীক্ষার চাপ, আর্থিক বিষয় জটিলতা, ব্যবসায় হঠাৎ অবনতি ইত্যাদি।

চিকিৎসা:

- **মূলত:** Psychotherapy/counselling গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওষুধের ভূমিকা এখানে অল্প এবং স্বল্প সময়ের জন্য।
- Psychotherapy/counselling চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে- রোগীর মনের অবদমিত কষ্ট সনাক্ত করা এবং সেটা রোগীকে প্রকাশ করতে সাহায্য করা ও সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা, রোগীর শারীরিক উপসর্গের প্রতি মনোযোগ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার এবং তার দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান।

কনভারশন ডিস্‌অর্ডার বা হিস্টিরিয়া একটি সাধারণ ও চিকিৎসাযোগ্য মানসিক রোগ। সময়মতো চিকিৎসায় রোগী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করে এবং স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন যাপন করে।

কনভারশন ডিসঅর্ডারের চিকিৎসায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়:

- প্রাথমিকভাবে কনভারশন ডিসঅর্ডারের (হিস্টিরিয়ার) লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করা এবং নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রেরণ।
- কনভারশন ডিসঅর্ডারের উপসর্গসমূহের যে কোন শারীরিক কারণ নেই সেই বিষয় রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনকে নিশ্চিতকরণ ও আশ্বাস প্রদান।
- এ রোগ সম্পর্কে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা।
- রোগীর নিয়মিত ফলো-আপের বিষয় রোগীর আত্মীয়স্বজনকে অবহিতকরণ।

মাস্‌-হিস্টিরিয়া (Mass hysteria):

যখন একই সাথে অনেক ব্যক্তি কনভারসন ডিস্‌অর্ডার বা হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয় তখন তাকে মাস হিস্টিরিয়া বলে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকেরই একই ধরনের উপসর্গ থাকে। প্রথমে একজনের শুরু হয় এবং অন্যরা পরপর বা একই সাথে আক্রান্ত হয়।

এ রোগের চিকিৎসা কনভারসন ডিস্‌অর্ডারের (হিস্টিরিয়ার) মতো।

মডিউল ৭

শিশু-কিশোরদের মানসিক সমস্যা (Mental Disorder in Child and Adolescent)

কী জানবো:
- শিশু-কিশোরদের কী ধরণের মানসিক সমস্যা হয়
- শিশু-কিশোরদের মানসিক সমস্যার লক্ষণ ও কারণ
- শিশু-কিশোরদের মানসিক সমস্যার চিকিৎসা
- শিশু-কিশোরদের মানসিক সমস্যায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, কেস উপস্থাপন/রোল প্লে, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যা

শিশু কিশোরদের মানসিক সমস্যাকে তিনটিভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১. বিকাশজনিত মানসিক সমস্যা: যেমন-বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, অটিজম
২. আবেগজনিত মানসিক সমস্যা: যেমন-স্কুল ভীতি, সেপারেশন এংজাইটি, বিছানায় প্রস্রাব
৩. আচরণজনিত মানসিক সমস্যা: অতি চঞ্চল অমনোযোগী শিশু, কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার

মনে রাখতে হবে যে একই শিশুর মধ্যে একসাথে একাধিক ধরণের সমস্যা ও লক্ষণ থাকতে পারে :

কেস/রোল প্লে:১

[রামলালের বয়স কম ছিল, কিন্তু দুষ্টুবুদ্ধি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত। অত্যাচার যে তাহার কখন কোন্ দিক দিয়া কিভাবে দেখা দিবে, সে কথা কাহারও অনুমান করিবার জো ছিল না আসবার সময় বৌদি মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেছে, নইলে দাঁতগুলো তোমার সদ্যই ভেঙ্গে দিয়ে ঘরে যেতুম। তা শোন, ভাল ওষুধ নিয়ে এখনি এস, দেরি করো না। আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনে কলমের আমবাগান করেচ, বেশি বড় হয়নি ত, - ও কুড়ুলের এক-এক ঘায়েই কাত হবে- ওর একটিও আজ রাত্তিরে থাকবে না। কাল এসে এই শিশিবোতলগুলো গুঁড়ো করে দিয়ে যাব। বলিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। ডাক্তার নিক্তি ধরিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন।]

—রামের সুমতি/শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতি চঞ্চল অমনোযোগী শিশু (এটেনশন ডিফিশিট হাইপারএকটিভিটি ডিসঅর্ডার-এডিএইচডি)

চঞ্চলতাকে ছাপিয়ে একটি শিশু যখন অতিমাত্রায় অমনোযোগি হয়ে উঠে, বাড়ি বা স্কুল কোথাও মুহূর্তের জন্য মনসংযোগ করতে পারে না, হঠাৎ রেগে কাউকে আঘাত করে তখন এ ধরণের অমনোযোগিতা আর সাথে অত্যধিক অস্থিরমতি হয়ে থাকাটাকে অসুস্থতা হিসেবে গণ্য করা হয়- এ রোগটিকে বলা হয় অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারএকটিভ ডিসর্অডার, বাংলায় বলা যেতে পারে 'অতি-চঞ্চল অমনোযোগী শিশু'।

লক্ষণ:

- একমুহূর্ত চুপ করে বসে না, অতিরিক্ত চঞ্চলতা করে
- অত্যধিক ছোটাছুটি করে
- প্রায়শই শরীরে আঘাত পায়
- অনেক সময় কথা বেশি বলে
- ঘরের জিনিসপত্র বেশি নাড়াচাড়া করে, ভেঙে ফেলে
- কোনো বিষয়ে বেশিক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না এমনকি খেলাধুলাতেও
- হঠাৎ করে কোনো কারণ ছাড়াই উত্তেজিত হয়ে উঠে
- কোনো কাজ গুছিয়ে করতে পারে না, নিজের জিনিস গুছিয়ে রাখতে পারে না, স্কুলে গেলে প্রায় প্রতিদিনই কিছু হারিয়ে আসে
- অন্যের কথায় ও কাজে বাধা দেয়

অভিভাবকদের করণীয়:

- রুটিন তৈরি করা, ও তা মেনে চলতে উৎসাহিত করতে হবে
- বাসার জন্য নিয়ম তৈরি করা ও সকলে তা মেনে চলা
- ভালো কাজের পুরস্কার দিতে হবে
- শিশুরবন্ধু-বান্ধবের সহায়তা লাগতে পারে
- শিকদের সম্পৃক্ত করতে হবে
- কৃত্রিম রঙযুক্ত খাদ্য বর্জন করতে হবে
- শিশুর সাথে রূঢ় আচরণ পরিহার করতে হবে

- অনাকাঙ্খিত আচরণের দিকে মনোযোগ না দেয়া
- একা একা খেলা যায় এমন খেলাকে উৎসাহিত করতে হবে :
- চিকিৎসা গ্রহণ: চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলুন। নিয়মিত ওষুধ খাওয়ান এবং চিকিৎসক নির্দেশিত আচরণবিধি মেনে চলুন।

শিশুর বিছানায় প্রস্রাব

- সাধারণত ৪-৫ বছর বয়সের মধ্যেই একটি শিশু তার প্রস্রাব নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। প্রয়োজনে মা-বাবার সাহায্য নেয়। কিন্তু কোনো কোনো সময় এই বয়সের পরেও বিভিন্ন কারণে শিশুটির প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা রপ্ত হয় না। তখন সে ঘুমালে, বিশেষ করে রাতে বিছানা ভেজায়।
- এ সমস্যা মানসিক কারণ ছাড়াও শারীরিক (মূত্রাশয় এর রোগ) কারণেও হতে পারে- তাই শারীরিক রোগের জন্যও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা লাগতে পারে।
- পরিবারে এ ধরণের সমস্যা ভাই বোন বা বাবা-মার থাকলে, মানসিক চাপযুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠলে, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় না হলে, মা এর কাছ থেকে কোনো কারণে শিশুটি দূরে থাকলে, বারবার বাসা বদলালে, নতুন ভাই বা বোনের জন্ম হলে, এবং শিশু যদি মানসিক বা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয় তবে এ রোগের সম্ভাবনা বাড়তে পারে।
- শিশুর যাতে এ সমস্যা না হয় সেজন্য ২০ মাস বয়স থেকেই তাকে প্রস্রাব পায়খানা নিয়ন্ত্রন করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণ দিতে হবে ধীরে ধীরে ধৈর্য নিয়ে- হঠাৎ করে তার কাছ থেকে আশা করা ঠিক হবেনা যে সে এক রাতের মধ্যে সব শিখে ফেলবে।
- অনেক সময় শিশু তার নিজস্ব আচরণের মাধ্যমে প্রস্রাব করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে- সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন ও তাতে সাড়া দিন।
- রাতে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাকে বাথরুমে নিয়ে যান এবং প্রস্রাব করার জন্য তাকে উৎসাহিত করুন।
- শিশুর খাদ্য তালিকায় আঁশযুক্ত খাবার যুক্ত করুন- এত তার কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হবে না , ফলে বাথরুমে যেতে তার অনিচ্ছা অনেকাংশে কমে যাবে।
- যথেষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও (৫-৬ বছর) বিছানায় প্রস্রাব করে এমন শিশুর জন্য কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলুন- যেমন- সন্ধ্যার পর শিশুকে অতিরিক্ত পানি পান করাবেন না, যে রাতে বিছানা ভেজাবে সে রাতে তাকেও ঘুম থেকে তুলুন ও তার ভেজা কাপড়, কাঁথা, বিছানার চাদর বদলানর সময় তাকেও ছোটখাট কিছু কাজ করতে দিন। আবার যে রাতে সে বিছানা ভেজাবেনা তার পরবর্তী সকালে তাকে ছোট কোনো উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করুন। ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে হিসাব রাখুন-মাসে কতদিন সে বিছানা ভেজায় আর কতদিন ভেজায় না। ক্যালেন্ডারটি তাকে দেখান এবং যে কটি দিন সে বিছানা ভেজায় না তা হিসেব করে ততটি চকলেট বা ছোট স্টিকার তাকে উপহার দিন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক কলিংবেলযুক্ত বিশেষ ধরণের বিছানা ব্যবহার করা যেতে পরে।

স্কুল ভীতি

- স্কুলগামী অনেক শিশু বিভিন্ন কারণে স্কুলে যেতে চায় না। দেখা যায় স্কুলে যাবার ঠিক আগে আগে আগে তাদের কেউ অহেতুক কান্নাকাটি করে- কেউ পেট ব্যথায় মাটিতে গড়ায়, কারো মাথা ব্যথা হয় আবার কেউবা ওয়াক ওয়াক করে বমির ভাব করে।
- প্রথমবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলে, স্কুলে বন্ধুরা উত্যক্ত করলে, টিটকারি দিলে, তাকে নিয়ে অযথা হাসাহাসি করলে, হঠাৎ স্কুল পরিবর্তণ করলে, শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হলে (বাংলা মাধ্যম থেকে ইংরেজী, ইংরেজী মাধ্যম থেকে বাংলা বা সাধারণ শিক্ষা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা), লম্বা ছুটির পর স্কুলে যাবার সময়, পরিবারের কোনো নিকটজনের মৃত্যু হলে, মা-বাবার মধ্যে দাম্পত্য কলহ হলে, স্কুলের পড়ার সাথে তাল মেলাতে না পারলে, পরিবারের কোনো সদস্য প্রতিনিয়ত তার স্কুলে যাওয়াকে নিরুৎসাহিত করলে, শিক্ষকের আচরণ রূঢ় হলে অথবা শিশুর সত্যিকারের কোনো শারীরিক সমস্যা থাকলে তার মধ্যে স্কুলভীতি দেখা দিতে পারে।

- মা-বাবা শিশুকে আশ্বস্ত করবেন। স্কুল সম্পর্কে শিশুকে ইতিবাচক ধারণা দেবেন। দীর্ঘদিন স্কুলভীতি থাকলে প্রথমে তাকে স্কুল সময়ের বাইরে যেমন ছুটির দিনে বা বিকেলে স্কুল প্রাঙ্গনে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। এরপর স্কুল সময়ে তাকে অল্প অল্প করে স্কুলে থাকা অভ্যাস করাতে হবে- এবং একসময় পূর্ণ সময়ের জন্য স্কুলে রাখতে হবে।
- এ বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষকের সাথে খোলামেলা আলাপ করতে হবে। শিশুর সাথে তার পড়ালেখার সমস্যা থাকলে সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে- অযথা তাকে কোনো প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয়া যাবে না। ভালো ফল করতেই হবে এমন কোনো শর্ত তার উপর আরোপ করা চলবে না।
- শিশুর স্কুল চলাকালীন সময়ে বাসায় কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা চলবে না।
- শিশুকে দৈনন্দিন রুটিন তৈরি করে দিতে হবে ও তা মেনে চলার অভ্যাস করাতে হবে।
- শিশুর ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করা যাবে না। শিশুকে 'তুই-তোকারি' সম্বোধন না করাই ভালো। পড়াশোনায় পিছিয়ে থাকা শিশুটির জন্য বাড়তি যত্ন নিতে হবে।

অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ (কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার)

- অনেক শিশু কিশোর তাদের স্বভাবসুলভ আচরণ না করে অভিভাবকের অবাধ্য হয়ে ওঠে এবং নানান অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে। সমাজের সাথে তারা সঠিকভাবে মিশতে পারেনা।তাদের এ সমস্যাকে বলা হয় 'কন্ডাক্ট ডিজঅর্ডার' বা আচরণজনিত সমস্যা।
- এ ধরণের সমস্যা শিশুর মনোবিকারজনিত সমস্যা। বাবা-মা যদি কোনো অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন, সমাজবিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকেন, ছোটবেলায় যদি শিশুর বেড়ে ওঠা সঠিকভাবে না হয়, পিতা মাতির সাথে শিশুর সম্পর্ক যদি গতানুগতিক ও স্বাভাবিক না হয়, শিশু যদি শৈশবে কোনে ধরণের শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়, যদি স্কুলের পরিবেশ শিশুর জন্য প্রতিকুল থাকে,যদি শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভালো না হয় তবে শিশুর আচরণের সমস্যা হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আবার উপরের কোনো কারণের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও শিশু-কিশোরের আচরণগত সমস্যা হতে পারে। আবার জেনেটিক কারণেও এ ধরণের সমস্যা হতে পারে।
- এ ধরণের সমস্যায় আক্রান্ত শিশু কিশোরদের মধ্যে যে লক্ষণগুলো দীর্ঘসময় ধরে বিদ্যমান থাকতে পারে তা হলো- অন্যদেরকে উপহাস, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, হুমকি দেয়া বা আতংকিত করার চেষ্টা করা; হঠাৎ করে মারামারিতে জড়িয়ে পড়া; মারামারির সময় অস্ত্র ব্যবহার করা; অন্য মানুষদের শারীরিকভাবে নিষ্ঠুর পীড়ন করা; বিভিন্ন পশু পাখির প্রতি নির্দয় হওয়া- যেমন বেড়াল, কুকুর বা পাখিদের কষ্ট দেয়া বা হত্যা করা; চুরি করা; মিথ্যা বলা; অন্যকে যৌন হয়রানি করা; কোনো কিছু নষ্ট করার জন্য আগুন লাগিয়ে দেয়া; বিনা কারণে অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি করা; বিনা কারণে ঘর বা গাড়ি ভাঙচুর করা; সবসময় অভিভাবকের বিরুদ্ধাচারণ করা; বিনা অনুমতিতে, কোনো যোগাযোগ না করে রাত্রে বাসার বাইরে থাকা; গভীর রাতে বাসা থেকে একাধিকবার বের হযে যাওয়া এবং প্রায়শই স্কুল পালানোর অভ্যাস থাকা।
- এ আচরণজনিত সমস্যার জন্য শিশুর প্রতি, তার পরিবারের প্রতি এবং তার চারদিকের পরিবেশের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। শিশুকে তার আচরণ পরিবর্তণের জন্য সুযোগ দিতে হবে। প্রথমেই সমাজের চোখে তাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। তাকে সামাজিক দক্ষতা শেখার জন্য ছোট ছোট সামাজিক আচরণ রপ্ত করাতে হবে। ছোট ছোট সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায এ বিষয়ে তাকেই সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ করে দিতে হবে। প্রয়োজনে তাকে বিশেষজ্ঞের তত্বাবধানে 'কাউন্সেলিং' ও প্রয়োজনীয় সাইকোলজিক্যাল চিকিৎসা প্রদান করতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ মত তাকে ওষুধ সেবন করাতে হবে।
- শিশুর মাতা-পিতাকে হতে হবে সহনশীল। অযথা রূঢ় আচরণ করা চলবে না। নিজেদের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন আরো দৃঢ় করতে হবে। শিশুর সামনে দাম্পত্য বা পারিবারিক কলহ পরিহার করতে হবে। শিশুকে নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে এবং সপরিবারে বেড়াতে যেতে হবে। শিশুর প্রতি যেমন রূঢ় হওয়া চলবে না তেমনি অত্যধিক আদরও তাকে দেয়া যাবে না- যখন তখন তার সকল আব্দার মেটানো চলবে না। শিশুকে নৈতিকতাবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন এবং দেশীয় সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে হবে। পরিবারের পাশাপাশি এ ধরণের শিশুদের প্রতি সমাজকেও হতে হবে সহনশীল ও সহানুভূতি সম্পন্ন। শাস্তির বদলে তাকে সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে। 'ভালো কাজের জন্য প্রশংসা-পুরষ্কার এবং মন্দ কাজের জন্য পুরষ্কার-প্রশংসা বন্ধ'- এ নিয়ম অনুসরণ করতে হবে।

মডিউল ৮

অটিজম
(Autism)

কী জানবো:
- অটিজম কী
- অটিজমের লক্ষণ ও কারণ
- অটিজমের পরিচর্যা
- অটিজম আছে এমন শিশুর মা-বাবার জন্য পরামর্শ
- অটিজম সমস্যায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, কেস উপস্থাপন/রোল প্লে, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

অটিজম (Autism)

কিছু শিশু রয়েছে যারা নিজের ভেতর গুটিয়ে থাকে, সামাজিকভাবে আর দশটা শিশুর মত বেড়ে উঠেনা এবং তাদের আচরণে কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। এ ধরণের লক্ষণ থাকলে তাকে বলা হয় অটিজম। যেসব শিশুর অটিজমের সমস্যা আছে তাদের বলা হয় অটিস্টিক শিশু। বেশিরভাগ অটিস্টিক শিশুর ক্ষেত্রে বয়স ৩ বছর হবার আগেই লক্ষণগুলো দেখা দেয়।

কেস/রোল প্লে:

তিন বছরের ছোট্ট ছেলে 'অ'। তিন বছর বয়স হলেও সে ঠিকমত কথা বলতে শিখেনি। দুটি শব্দ ব্যবহার করে সে নিজে থেকে কোনো অর্থপূর্ণ বাক্য বলতে পারে না। তবে মাঝে মাঝে অন্যের বলা কথা বারবার বলতে থাকে। একই কাজ বারবার করে। নাম ধরে ডাকলে সাড়া দেয়না, সমবয়সীদের সাথে মেশে না। বাবা-মায়ের চোখে চোখ রেখে তাকায় না। প্রতিদিন নিজস্ব রুটিন মেনে চলতে ভালবাসে। রুটিনের ব্যতিক্রম হলে সে মন খারাপ করে বা রেগে যায়। মাঝে মাঝে সে কোনো কারণ ছাড়াই উত্তেজিত হয়ে উঠে।

প্রধানত যে তিনটি ক্ষেত্রে অটিজম এর সমস্যা দেখা যায়

অটিজম রয়েছে এমন শিশুর চিকিৎসার প্রথম ধাপ হচ্ছে দ্রুত তার অটিজমের সনাক্তকরণ। এজন্য তিন বছর বয়সের শিশুর মধ্যে যে লক্ষণগুলি দেখলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন তা হচ্ছে ঃ

- শিশুর ভাষা শিখতে সমস্যা
  --এক বছর বয়সের মধ্যে 'দা..দা ' 'বা..বা' 'বু..বু' উচ্চারণ না করা
  --দুই বছর বয়সের মধ্যে অর্থপূর্ণ দুটি শব্দ দিয়ে কথা বলতে না পারা
- শিশু যদি চোখে চোখ না রাখে
- নাম ধরে ডাকলে সাড়া না দেয়
- অন্যের সাথে মিশতে সমস্যা হয় এবং আদর নিতে বা দিতে সমস্যা হয়
- হঠাৎ করে উত্তেজিত হয়ে উঠে
- সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে সমস্যা
- পছন্দের বা আনন্দের বস্তু/বিষয় সে অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করতে না পারা
- অন্যের বলা কথা বার বার বলে
- বার বার একই আচরণ করা
- শব্দ, আলো ইত্যাদি বিষয়ে কম বা বেশি প্রতিক্রিয়া দেখানো
- একটি নিজস্ব রুটিন মেনে চলতে পছন্দ করা, আশেপাশের কোনো পরিবর্তন সহ্য করতে না পারা

এ লক্ষণগুলি সাধারণত তিন বছর বয়সের মধ্যে দেখা যায়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে আরেকটু পরেও দেখা দিতে পারে।

বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে উপরের কোনো লক্ষণ অল্প সময়ের জন্য কোনো শিশুর মধ্যে থাকলেই ধরে নেয়া যাবে না যে তার অটিজম আছে। তা নিশ্চিত হবার জন্য অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে।

অটিজম রয়েছে এমন শিশুর বাবা মায়ের জন্য সাধারণ কিছু পরামর্শ :

- **লক্ষণগুলোকে গোপন করবেন না:** সন্তানের এ ধরণের লক্ষণকে লুকিয়ে রাখবেন না বা আড়াল করবেন না।
- **হতাশ হবেন না :** অযথা ভেঙে পড়বেন না, হতাশাগ্রস্ত হবেন না। আপনার হতাশার কারণে সন্তানের ভবিষ্যৎ আরো বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
- **বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকুন:** যে কোনো ধরণের বিভ্রান্তি, অপপ্রচার ও অপচিকিৎসা থেকে মুক্ত থাকুন। সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে অটিজম এর সনাক্তকরণ ও পরিচর্যার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক কেন্দ্র রয়েছে। সন্তানকে দ্রুত সেখানে নিয়ে আসুন।
- **সমস্যাটির ব্যাখ্যা গ্রহণ করুন:** সন্তানের অসুস্থতার ব্যাখা গ্রহণ করুন। পরিবারের কোনো সদস্য/প্রতিবেশী/বন্ধু বান্ধবের বিজ্ঞান সম্মত পরামর্শ গ্রহণ করুন।
- **পরিবারের সদস্যরা মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন:** পরিবারের সকল সদস্য মিলে শিশুর পরিচর্যা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হোন।
- **নিজেদের দায়ী করবেন না:** অটিজমের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেন শিশুটির এ সমস্যা হলো তা নিয়ে অভিভাবকেরা নিজেদেরকে বা একে অপরকে দায়ী করবেন না। পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখুন।
- **ধৈর্য ধরুন:** অটিজম যে ধরণের সমস্যা সে ধরণের সমস্যা সমাধানের কোনো রাতারাতি চিকিৎসা পদ্ধতি নেই- রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যা পরিকল্পনা। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যার মাধ্যমে এ সমস্যায় আক্রান্ত শিশু ফিরে আসতে পারে সমাজের মূল স্রোত ধারায়। তাই অযথা ধৈর্য্যহারা হওয়া ঠিক নয়। সমস্যাটির স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করতে হবে। চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি আস্থা হারাবেন না।
- **সামাজিকতা শেখানো:** পরিবার থেকেই সামাজিকতা শেখাতে হবে সকল শিশুকে- আর অটিজম আছে এমন শিশুর ক্ষেত্রে তো বটেই। বড়দের সম্মান করা, হাসির প্রত্যুত্তরে হাসা, সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতির শিক্ষা দেবার জন্য শিশুর সাথে এসব সামাজিকতা আনুষ্ঠানিকভাবে করতে হবে। সামাজিকতা বাড়ায় এমন আচরণ যেমন- সালাম দেওয়া, ধন্যবাদ দেয়া, টা টা, বাই বাই ইত্যাদির চর্চা থাকতে হবে।
- **সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ:** বিভিন্ন দাওয়াত, সামাজিক অনুষ্ঠান, বড় আয়োজনে শিশুটিকে সংগে নিন। লোকলজ্জার ভয়ে শিশুটিকে ঘরে বন্দী করে রাখবেন না।
- **শিশুর সাথে খেলতে হবে:** শিশুটির সাথে প্রতিদিন কিছুটা সময় নিয়ে মজা করে খেলুন। শিশুটির সাথে আনন্দঘন ও আরামদায়ক পরিবেশে সময় কাটান।
- **শিশুকে খেলতে দিতে হবে:** অটিজম রয়েছে এমন শিশুকে খেলা বিষয়ে উৎসাহিত করুন ও খেলার সুযোগ করে দিন। একা একা খেলা যায় এমন খেলার প্রতি নিরুৎসাহিত করে অনেকে মিলে খেলতে পারে এমন খেলা, যেমন বল খেলা, কাল্পনিক/মিছেমিছি খেলা, ছোঁয়াছুয়ি, গঠনমূলক খেলা শেখাতে হবে এবং খেলতে উৎসাহিত করতে হবে।
- **কথা শেখাতে হবে:** অটিজম আছে এমন শিশুর অন্যতম প্রধান সমস্যা তার কথা শিখতে না পারা। কথা শেখানোর জন্য তাকে একটা করে জিনিস নিয়ে সেগুলোর নাম স্পষ্ট করে শেখাতে হবে। ছোট ছোট শব্দ আগে শেখাতে হবে। তার সাথে কথা বলতে হবে।
- **প্রতীকি ভাষার ব্যবহার বোঝাতে হবে:** শিশুকে ইশারা ইংগিত, অংগভংগি বা ছবির সাহায্যে ভাব প্রকাশ করা শেখাতে হবে। তার প্রয়োজনগুলোকে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করুন।
- **শব্দভান্ডার ব্যবহার করতে হবে:** শিশুর শব্দভান্ডার যাই হোকনা কেন সেগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। যে শব্দগুলো সে ভালো পারে সেগুলি দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাক্য তৈরি শেখাতে হবে, পাশাপাশি নতুন শব্দ শেখানোর জন্য ছবি, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

- **ব্যক্তিগত কাজ শেখানো:** শিশুর নিজের ব্যক্তিগত কাজ- যেমন দাঁত ব্রাশ করা, জামা কাপড় পরা, নিজের যত্ন নিজে নেয়া, এধরণের কাজে পর্যায়ক্রমে অভ্যস্ত করাতে হবে। শিশুটিকে পরনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা যাবে না।
- **শখকে প্রাধান্য দেয়া:** শিশুকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ বা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশ নেয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। যেমন, গান গাইতে চাইলে সেটা শেখানো, ছবি আকঁতে চাইলে উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে যে বিষয়ে শিশুর ঝোঁক আছে সেদিকে উৎসাহ দিতে হবে।
- **বাবা-মাকে প্রশিক্ষণ:** যে শিশুর অটিজম রয়েছে তার সঠিক পরিচর্যা এবং তার সর্বাঙ্গিন কল্যানের জন্য বাবা-মা এবং প্রয়োজনে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও প্রশিক্ষন নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।
- **গ্রুপ তৈরি ও গ্রুপে প্রশিক্ষণ:** বিশেষায়িত স্কুলের পাশাপাশি যে শিশুদের অটিজম আছে তাদের অভিভাবকেরা নিজেরাও গঠন করতে পারেন 'সেল্ফ হেল্প গ্রুপ' বা 'অভিভাবক ফোরাম'। এতে করে নিজেদের সাধারণ সমস্যাগুলো আলোচনা করার পাশাপাশি সমাধানের পথও খুঁজে পেতে পারেন।
- **কাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য পুরস্কার:** শিশু যদি কাঙ্ক্ষিত আচরণ করে তবে তার জন্য তাকে পুরস্কার ও উৎসাহ দিতে হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য তিরস্কার না করে কারণ জানার চেষ্টা করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।
- **দিনলিপি সংরক্ষণ:** একটি ডায়েরীতে শিশুর আচরণ ও অভ্যাসের তালিকাগুলো নিয়মিত সংরক্ষণ করতে হবে। এতে করে বোঝা যাবে তার আচররণের পরিবর্তন কতটুকু হচ্ছে- এবং কী হারে হচ্ছে। এটা দেখে পরবর্তী করণীয় ও আনুসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

যে পরিবারে একজন অটিস্টিক শিশু রয়েছে সে পরিবারের সদস্য বিশেষ করে বাবা-মায়ের জন্য প্রয়োজন বিশেষ সেবা-পরামর্শ। তারা যেন অটিস্টিক শিশুটিকে নিজেদের বোঝা মনে না করেন অথবা শিশুর অটিজমকে লুকিয়ে না রেখে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করেন সে বিষয়ে সকলেরই সচেতনতা প্রয়োজন।

মডিউল ৯

মাদকাসক্তি
(Substance Use Disorder)

কী জানবো:
- মাদকাসক্তি কী
- মাদকাসক্তির কারণ ও লক্ষণ
- মাদকাসক্তির পরিণতি
- মাদকাসক্তির চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি সমস্যায় নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, কেস উপস্থাপন/রোল প্লে, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

মাদকাসক্তি (Substance Use Disorder)

মাদকদ্রব্য হল উত্তেজনা ও অবসাদ সৃষ্টিকারী যে সকল দ্রব্য গ্রহণে মানুষের স্বাভাবিক চেতনা লোভ পেয়ে নেশার সৃষ্টি করে আচরণের পরিবর্তন ঘটায়। মাদকাসক্তি হল নিয়মিত মাদক সেবনের ফলে যাহা মানসিক ও শারীরিক নির্ভরতার জন্ম দেয়, বন্ধ করলে প্রত্যাহারজনিত উপসর্গ দেখা দেয় এবং ক্রমাগত নেশার প্রতি আকর্ষণ ও ব্যবহৃত মাত্রার পরিমাণ দিন দিন বেড়ে যায় ও দৈনন্দিক কাজে সমস্যার সৃষ্টি করে। সাধারণত উঠতি বয়সী তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে এর পাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ভাং, গাঁজা, চরস, তাড়ি, সিদ্ধি ইত্যাদি ব্যবহারের ইতিহাস পাওয়া যায়। বর্তমানে হেরোইন, পেথেডিন, ঘুমের বড়ি, এলকোহল, ফেনসেডিল এবং অন্যান্য কফ সিরাপে আসক্তি রোগীর সংখ্যা বেশি। সম্প্রতি ইয়াবা নামক মাদকদ্রব্য গ্রহণ বাংলাদেশে বেড়ে গেছে।

কেস/রোল প্লে:১

উনিশ বছর বয়সী 'ক'। ইদানিং রাত করে বাড়ি ফেরে। বাবা-মায়ের সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করে। কারনে অকারণে টাকা চায়। টাকা না পেরে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। প্রচুর মিথ্যা বলে। নতুন নতুন বন্ধু তৈরি হয়েছে। সারা রাত দরজা বন্ধ করে জেগে থাকে, সারা দিন ঘুমায়। বাথরুমে বেশি সময় অতিবাহিত করে। পড়া লেখায় খুবই খারাপ ফলাফল করছে। চোখ সবসময় লাল থাকে।

মাদকাসক্তির কারণসমূহ:

- মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা: ইহার কারণে মাদকাসক্তির প্রকোপ প্রবল
- মাদকদ্রব্য সমন্ধে কৌতূহল
- বন্ধুদের চাপে পড়ে মাদক গ্রহণ
- হতাশা, ব্যর্থতার কাটাতে মাদক গ্রহণ
- পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব
- নিছক আনন্দের জন্য
- পরিবারে মাদকের প্রভাব
- ধুমপানের অভ্যাস

মাদকাসক্তির লক্ষণসমূহ:

শারীরিক লক্ষণসমূহ:

- লাল ও ছলছলে চোখ
- ক্ষুধামন্দা, বমিবমি ভাব, বমি হওয়া
- ভারসাম্যহীনতা
- হাত-পা কাঁপা
- বুক ধড়ফড় করা
- অতিরিক্ত দুর্বল লাগা, ঘুম ঘুম ভাব
- হাত-পায়ের শিরায় সুঁচ ফোটানোর দাগ এবং ফুল হাতা শার্ট পরে এগুলো ঢাকার প্রচেষ্টা
- স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়া এবং খাওয়া দাওয়ার অভ্যাসে পরিবর্তন হওয়া

আচরণগত লক্ষণসমূহ:

- লেখাপড়া খারাপ করা
- নিজের ও পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন
- যখন তখন বাইরে যাওয়া, অধিক রাতে ঘরে ফেরা
- পরিবারের সবার সাথে সংসারের কাজে এগিয়ে না আসা এবং বেশি বেশি হাত খরচের টাকা-পয়সা চাওয়া
- বিছানার আশপাশে এবং বালিশ ও বিছানার নীচে ট্যাবলেটের খালি ষ্ট্রিপ পড়ে থাকা
- অধিক রাতে নিদ্রা যাওয়া এবং দিনের বেলায় ঘুমানো
- অনেক সময় অপ্রকৃতস্থ অবস্থায় ঘরে ফেরা এবং পরিবারের লোকজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করা
- খিটখিটে মেজাজ
- প্রায়ই মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা
- প্রায়ই রাস্তাঘাটে দুর্ঘটনার কবলে পতিত হওয়া
- অসামাজিক ও অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া
- নতুন (নেশাগ্রস্ত) বন্ধুবান্ধব হওয়া ও পুরোনো ভাল বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক না রাখা
- কাউকে পরোয়া না করা

মাদকাসক্তির পরিণতি:

- ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক কর্মকান্ড ব্যাহত হয়
- বিভিন্ন ধরনের শারীরিক রোগ, যেমন- লিভার, কিডনী, ব্রেইন ইত্যাদি অঙ্গের রোগ হতে পারে এমনকি মৃত্যু হতে পারে এমন রোগেও আক্রান্ত হয়, যেমন- এইডস্, হেপাটাইটিস ইত্যাদি
- ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যহানী হতে থাকে (ওজন অতিরিক্ত কম বা বেশী হতে পারে)
- যৌন সমস্যা, যেমন- যৌন অক্ষমতা, পুরুষত্বহীনতা হয়
- গর্ভকালীন সময়ে মাদকাসক্তি হলে গর্ভস্থ বাচ্চার ক্ষতি হয়
- ফুসফুস, খাদ্যনালী, পাকস্থলী ইত্যাদির ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে
- অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়া
- লেখাপড়া ও পেশাগত কাজে পিছিয়ে পড়া
- সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া
- আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া
- মানসিক চাপে ভোগে ও আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়
- স্মরণশক্তি কমে যায়

চিকিৎসা:

- মাদকাসক্তি বার বার হতে পারে এমন একটি মস্তিস্ক বা ব্রেইনের রোগ। সফলভাবে চিকিৎসা করার পরেও পুনরাসক্তি হতে পারে, সেই জন্য মাদকাসক্তি চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা পরিকল্পনা ও সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে।
- মাদকাসক্তি চিকিৎসার সর্বপ্রথম ধাপ হলো উক্ত ব্যক্তির মাদক ছাড়ার ব্যাপারে যথাযথ মোটিভেশন। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যদি মাদক ছাড়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তবে তাকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে এসে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে। মাদক ছাড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে মাদক প্রত্যাহারজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া। প্রত্যাহার জনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন মাদক বিভিন্ন রকম হয়।

- প্রত্যাহারজনিত সমস্যা- অস্থিরতা, অনিদ্রা, বমি, ডায়রিয়া, নাক দিয়ে পানি পরা, শরীরে প্রচন্ড ব্যথা বা জ্বালা পোড়া, খিঁচুনী, অস্থিরতা, অতিরিক্ত ঘামা হওয়া, ডিলেরিয়াম (স্থান, কাল পাত্র জ্ঞান না থাকা) ইত্যাদি।
- প্রত্যাহারজনিত সমস্যা মোকাবেলায় এন্টিসাইকোটিক, বেনজোডায়াজিপাম, ক্লোনিডিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া উচিত।
- ভর্তির জন্য সরকারি কেন্দ্র অথবা বেসরকারি যে সমস্ত কেন্দ্রে নিয়মিত চিকিৎসক যায় সে সমস্ত কেন্দ্রে যাওয়া উচিত।
- প্রত্যাহারজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমে গেলে কাউন্সিলিং, সাইকোথেরাপী ইত্যাদি দেওয়া হয়।

দীর্ঘ সময়ের জন্য মাদক মুক্ত থাকার জন্য নিম্নলিখিত উপদেশগুলো মানা প্রয়োজন-

- যে সমস্ত স্থানে মাদক পাওয়া যায় সে সমস্ত স্থানে যাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ।
- মাদকাসক্ত বন্ধুদের সম্পূর্ণ বর্জন।
- জীবনযাপন পদ্ধতি পরিবর্তন করে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি অবলম্বন।
- কোন সমস্যা বা মানসিক চাপে পড়লে সাইকিয়াট্রিস্ট (মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ) ও সাইকোলজিস্টদের (মনোবিদ) পরামর্শ নেয়া।
- পরবর্তীতে মাদক গ্রহণ করলে তা সাথে সাথে চিকিৎসকে জানানো।
- নিয়মিত ফলোআপ করা।
- মাদকাসক্তির ফলে রোগী অতিরিক্ত উত্তেজিত বা মানসিক সমস্যা হয়ে পড়লে এন্টিসাইকোটিক ওষধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এন্টিসাইকোটিকের সাইড-ইফেক্ট প্রশমিত করার জন্য প্রোসাইক্লিডিন ব্যবহার করা হয়।।

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়ঃ

- মাদকাসক্তির প্রাথমিক লক্ষণসমূহ চিহ্নিতকরণ ও রোগীর অভিভাবকদের লক্ষণসমূহ চিহ্নিত করতে সহায়তা করা
- মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে পাঠাতে উদ্বুদ্ধকরণ
- মাদকাসক্তির প্রভাবে সৃষ্ট তীব্র লক্ষণ সমূহের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান
- মাদকাসক্তি প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ
- সব বয়সের লোকদের মধ্যে বিশেষত শিশু-কিশোর ও তরুণদের মধ্যে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে মাদকের প্রতি ঘৃণা তৈরী করা
- নিয়মিত ফলোআপ এর জন্য উৎসাহ প্রদান
- মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী হিসাবে গণ্য না করে রোগী হিসাবে গণ্য করা

মডিউল ১০

মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ (Psychotropic Drugs)

কী জানবো:
- মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ওষুধ এর শ্রেণীবিভাগ,
- কার্যকারিতা ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

প্রশিক্ষণের উপকরণ:
মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা, প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ, প্রশ্নোত্তর

সময়:
৫০ মিনিট

মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ (Psychotropic Drugs)

ভূমিকা:

মানসিক রোগের আধুনিক চিকিৎসায় ঔষধ একটি অতি-প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পদ্ধতি। এসকল ঔষধ একত্রে সাইকোট্রপিক মেডিকেশন (Psychotropic drugs) বা মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ নামে পরিচিত। উন্নত দেশে ব্যবহৃত এসব ঔষধের প্রায় সবগুলি এদেশে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের সাধারণ শ্রেণীবিন্যাস:

- **অ্যান্টিসাইকোটিক ড্রাগস (Antipsychotic Drugs):** জটিল ধরনের মানসিক রোগ যেমন সিজোফ্রিনিয়া, বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার (ম্যানিয়া), ও অন্যান্য সাইকোটিক ডিসঅর্ডার (যখন রোগীর ভ্রান্ত বিশ্বাস, হ্যালুশিনেশন, অস্বাভাবিক কথাবার্তা ও আচরণ থাকে) এবং ভাংচুর ও সহিংস আচরণ নিয়ন্ত্রণে মানসিক রোগ চিকিৎসায় ঔষধ অপরিহার্য উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হ্যালোপেরিডল, ক্লোরপ্রোমাজিন, রিসপেরিডোন, ফ্লুফেনাজিন, ফ্লুপেনথিক্সল প্রভৃতি ট্যাবলেট ও ইনজেকশন (রিসপেরিডোন বাদে) হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এ ধরনের ঔষধ সেবন নিরাপদ, সহনীয় ও কার্যকর। তবে অন্যান্য রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের মতো এসকল ঔষধেরও কিছু সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে।
- **সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ:** হাত-পা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্ত হয়ে যাওয়া ও কাপা (রোগীর হাটা ও চলাফেরায় রোগীকে মূর্তি বা রোবটের মত মনে হয়), অতিরিক্ত লালা ঝরা, কোষ্ঠকাঠিণ্য, প্রস্রাবে অস্বস্তি, চোখে দেখতে সাময়িক অসুবিধা, সাময়িক ক্লান্তিবোধ ও ঘুমভাব, বসা অবস্থা হতে হঠাৎ দাড়ালে মাথা ঘুরানো, অতিরিক্ত অস্থিরতা, ওজন বেড়ে যাওয়া, মহিলাদের ক্ষেত্রে দেরিতে মাসিক হওয়া ইত্যাদি। প্রোসাইক্লিডিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহারে এসকল সমস্যার বেশীরভাগ সমাধান করা সম্ভব। রোগী ও অভিবাবকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও পর্যাপ্ত পরিমানে শাকসব্জি, ফলমূল ও তরল খাবার খেলে এ সমস্যা দূরা করা সম্ভব।

- **অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট ড্রাগস (Antidepressant Drugs):** বিষণ্নতা রোগে এসকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও অবশেসন এবং উদ্বেগজনিত রোগসমূহে বিষণ্নতারোধী এসকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

- **সাইক্লিক এন্টিডিপ্রেসেন্ট (TCA):** এ্যামিট্রিপটাইলিন, নরমিট্রিপটাইলিন, ইমিপ্রামিন, ক্লোমিপ্রামিন, সিলেকটিভ সেরোটনিন রিআপটেক ইনহিবিটর (SSRI): (যেমন- ফ্লুঅক্সিটিন, সারট্রালিন, এসসিটালোপ্রাম, প্যারোক্সিটিন, মিট্রাজেপিন) হিসেবে বহুল ব্যবহৃত।

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ: অতিরিক্ত ঘুমভাব, মুখ শুকিয়ে যাওয়া, কোষ্ঠকাঠিণ্য, ওজন বেড়ে যাওয়া, চোখে ঝাপসা দেখা, কিছু ক্ষেত্রে অনিদ্রা, অস্থিরতা, ও যৌন সমস্যা ইত্যাদি।

মুড স্ট্যাবিলাইজার (Mood Stabilizers): বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার এ সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

লিথিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট, কার্বামাজেপিন, ল্যামোট্রিজিন সাধারণত মুড স্ট্যাবিলাইজার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ: দীর্ঘ মেয়াদে লিথিয়াম সেবন করলে ওজন বেড়ে যাওয়া ও থাইরয়েড হরমোনের সমস্যা হতে পারে। প্রথম দিকে অতিরিক্ত প্রস্রাব ও পিপাসা এবং হাত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মৃদু কেঁপে উঠা হতে পারে।

জ্বর, ডায়রিয়া ও পানিশূন্যতা হলে মানবদেহে লিথিয়ামের মাত্রা বেড়ে গিয়ে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। এজন্য এসময় লিথিয়াম ট্যাবলেট বন্ধ রেখে রোগীকে প্রচুর ওরস্যালাইন পান করিয়ে দ্রুত চিকিৎসককের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

ভ্যালপ্রোয়েট সেবনে বমিভাব, অতিরিক্ত ঘুম, ওজন বেড়ে যাওয়া ও চুল পড়া প্রভৃতি সমস্যা হতে পারে।

- **অ্যান্টিঅ্যাংজাইটি ড্রাগস (Anti Anxiety Drugs):** এ ধরনের ঔষধ উদ্বেগ ও উদ্বেগজনিত মানসিক রোগ, আতংক রোগ ও অনিদ্রার সমস্যার ব্যবহৃত হয়।

বেনজোডায়াজেপিন গ্রপের এ ধরনের ঔষধের মধ্যে ডায়াজিপাম, নাইট্রাজিপাম ও ক্লোনাজিপাম এবং নন-বেনজেডায়াজেপিন, যেমন- প্রোপ্রানালল উল্লেখযোগ্য।

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ: অতিরিক্ত ঘুম, ঘুমভাব, চলা ফেরার সমস্যা এবং দীর্ঘসময় ব্যবহারে আসক্তি তৈরি হতে পারে।

- **অ্যান্টিইপিলেপ্টিক ড্রাগস (Anti Epileptic Drugs):** মৃগীরোগের (Epilepsy) চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট, কার্বামাজেপিন, ফেনোবার্বিটন, লেমোট্রিজিন ও বেনজোডায়াজেপিনস (ডায়াজিপাম, ক্লোনাজিপাম, ক্লোবাজাম) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সমূহ: অতিরিক্ত ঘুম, বমিভাব, ওজন বেড়ে যাওয়া প্রধান সমস্যা। কার্বমাজেপিন সেবনে মাঝে মাঝে ত্বকে র‍্যাশ (ফুসকুঁড়ি) দেখা দিলে ঔষধ সেবন বন্ধ রেখে দ্রত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা:

- মানসিক রোগের ঔষধ সেবনে মস্তিস্কের (ব্রেইন) ক্ষতি হয়; অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এ ধরনের কোন প্রমাণ নেই।
- এসকল ঔষধ সেবনে আসক্তি তৈরি হয়। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবনে এ সম্ভাবনা থাকে না।
- এসব ঔষধ মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু অন্যসব রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের মত মানসিকরোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত রোগের ঔষধেরও কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে যা সহনীয় পর্যায়ের।

নার্স ও প্যারামেডিক্সদের করণীয়

- রোগী ও তার আত্মীয় স্বজনকে ঔষধ সেবনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত রোগীর ঔষধ সেবন রোগী ও তার আত্মীয় স্বজনকে উৎসাহিত করা ।
- ঔষধের মাত্রা ও সেবনের নিয়মাবলী ভালভাবে রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনকে বুঝিয়ে দেয়া ।
- সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনকে অবহিত করা ও এজন্য করণীয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা।
- যেসকল ক্ষেত্রে রোগীর নিকট ঔষধ রাখা ঝুঁকিপূর্ণ (আত্মহত্যার প্রবণতা) সেসব ক্ষেত্রে ঔষধ অভিবাবকের তত্ত্বাবধানে নিরাপদে সংরক্ষণ করার পরামর্শ প্রদান করতে হবে।
- চিকিৎকের পরামর্শ ব্যতিত ঔষধ বন্দ্ধ করা যাবে না।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিত অন্য কোন ঔষধ সেবন থেকে বিরত থাকার পরামর্শ প্রদান।
- প্রয়োজনীয় ক্ষেতে দ্রুত চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করা ও হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ প্রদান।
- মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ সম্পর্কে বিদ্যমান প্রচলিত ভ্রান্ত ধারনা দূরীকরণে রোগী ও তার আত্মীয়স্বজনকে সহযোগিতা প্রদান করা।

মানসিক রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ এ ধরনের রোগ চিকিৎসাা জন্য অপরিহার্য বিষয়।

মানসিক রোগের চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান (সরকারি পর্যায়)

- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মেন্টাল হেল্‌থ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ঃ
  শিশু-কিশোর, প্রাপ্তবয়স্ক ও প্রবীণদের পৃথক বিভাগের মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা সাইকোথেরাপি, বিহেভিয়ার থেরাপিসহ বিনোদনমূলক ও অন্যান্য মনোসামাজিক চিকিৎসা সেবা চালু রয়েছে।
- অন্তঃবিভাগ, বহিঃবিভাগসহ ২৪ ঘন্টা জরুরি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিদ্যমান মানসিক রোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণ ও কোর্স চালু আছে। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করছে।
- মানসিক হাসপাতাল, পাবনা
- দেশের সকল উপজেলা ও জেলা হাসপাতাল ছাড়াও ৪টি মডেল উপজেলা হাসপাতালে (সোনারগাঁও, কালীগঞ্জ, কেরাণীগঞ্জ ও ধামরাই) বিশেষ চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে
- মনোরোগ বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
- মনোরোগ বিভাগ, সকল সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- মনোরোগ বিভাগ, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালসমূহ

মানসিক রোগের চিকিৎসা সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি পর্যায়)

- মনোরোগ বিভাগ, বেসরকারি মেডিকেল কলেজসমূহ
- মাদকাসক্তি ও মানসিক ক্লিনিক
- মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞগণের ব্যক্তিগত চেম্বার